ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

স্বাস্থ্যখাতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

৬ নভেম্বর, ২০১৪

স্বাস্থ্যখাতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

গবেষণা উপদেষ্টা
অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল
চেয়ারপারসন, ট্রাস্টি বোর্ড, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ড. সুমাইয়া খায়ের
উপ-নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

গবেষণা তত্ত্বাবধান
শাহজাদা এম আকরাম, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণা প্রতিবেদন প্রণয়ন
তাসলিমা আক্তার, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

সম্পাদনা
সাধন কুমার দাস, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন
স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট অংশীজন এবং মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মূল্যবান মতামত এই গবেষণা প্রতিবেদনটিকে সমৃদ্ধ করেছে। তাদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। খসড়া প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও মূল্যবান মতামত প্রদানে টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার শাহজাদা এম আকরাম এবং প্রোগ্রাম ম্যানেজার সাধন কুমার দাসের প্রতি কৃতজ্ঞতা। বিশেষ সহযোগিতার জন্য শরীফ আহমেদ চৌধুরী ও মোহাম্মদ হোসেনের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে গবেষনা ও অন্যান্য বিভাগের সহকর্মীরা মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করেন। তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
বাড়ি # ১৪১, সড়ক # ১২, ব্লক # ই
বনানী, ঢাকা ১২১৩
ফোন: ৮৮০-২-৮৮২৬০৩৬
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৮৮৪৮১১
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা নং

মুখবন্ধ ০৬
সার-সংক্ষেপ ০৭
অধ্যায় এক: ভূমিকা
১.১ গবেষণার প্রেক্ষাপট ১৭
১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা ১৮
১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য ১৯
১.৪ গবেষণা আওতা ১৯
১.৫ গবেষণা পদ্ধতি ১৯
১.৬ তথ্যের সত্যতা যাচাই, সম্পাদনা ও বিশ্লেষণ ২০
১.৭ গবেষণার সময় ২০
১.৮ গবেষণার সীমাবদ্ধতা ২০
১.৯ প্রতিবেদনের কাঠামো ২০

অধ্যায় দুই: স্বাস্থ্য খাতের আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো
২.১ ভূমিকা ২১
২.২ স্বাস্থ্যখাত সম্পর্কিত নীতি ও আইনি কাঠামো ২১
২.৩ আইনি কাঠামোর সীমাবদ্ধতা ও প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ ২২
২.৪ স্বাস্থ্য খাতের আর্থিক ব্যবস্থাপনা ২৮
২.৫ উপসংহার ৩১

অধ্যায় তিন: মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম
৩.১ ভূমিকা ৩২
৩.২ সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের জনবল ব্যবস্থাপনা ৩২
৩.৩ জনবল ব্যবস্থাপনায় সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি ৩৪
৩.৩.১ জনবলের স্বল্পতা ৩৪
৩.৩.২ নিয়োগে সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি ৩৬
৩.৩.৩ জনবল পদায়ন সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি ৩৮
৩.৩.৪ বদলি সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি ৩৮
৩.৩.৫ পদোন্নতি সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি ৪০
৩.৩.৬ চাকরিকালীন প্রশিক্ষণে সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি ৪১
৩.৩.৭ উচ্চতর প্রশিক্ষণে সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি ৪২
৩.৪ তদারকি ও জবাবদিহি ব্যবস্থা ৪৩
৩.৫ উপসংহার ৪৪

অধ্যায় চার: ক্রয়, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণে সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম
৪.১ ভূমিকা ৪৫
৪.২ স্বাস্থ্যখাতে বিভিন্ন ক্রয় ও তার প্রক্রিয়া ৪৫
৪.৩ পথ্য ক্রয়ে সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি ৪৬
৪.৪ ওষুধ ও চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ক্রয় ও সরবরাহে সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি ৪৬
৪.৫ রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা ৪৮
৪.৬ মেরামত ও সংস্কারে সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি ৪৮
৪.৭ উপসংহার ৪৯

অধ্যায় পাঁচ: সরকারি স্বাস্থ্য সেবামূলক কার্যক্রমে সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি
৫.১ ভূমিকা ৫০
৫.২ সার্বিকভাবে স্বাস্থ্যসেবায় অনিয়ম ও দুর্নীতি ৫০
৫.২.১ প্রতিষ্ঠানভেদে স্বাস্থ্যসেবায় অনিয়ম ও অনিয়ম ৫০
৫.২.২ ডাক্তারি সেবা ৫১
৫.২.৩ নার্স ও ব্রাদারের সেবা এবং আয়াদের সেবা ৫২
৫.২.৪ ডাক্তার দেখানোর ক্ষেত্রে সিরিয়াল ভঙ্গ ৫২
৫.২.৫ শয্যা ৫২
৫.২.৬ ওষুধ ও উপকরণ ৫২
৫.২.৭ বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ৫৩

৫.২.৮ পথ্যের মান ৫৩
৫.২.৯ ট্রলি সেবা ৫৩
৫.২.১০ ব্যান্ডেজ, ইনজেকশন, ও ড্রেসিং সেবা ৫৩
৫.২.১১ তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা ৫৩
৫.২.১২ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ৫৩
৫.১.১৩ দালালের সক্রিয় উপস্থিতি ৫৪
৫.৩ প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম ৫৪
৫.৩.১ অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা ৫৪
৫.৩.২ ওষুধ সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা ৫৪
৫.৩.৩ চিকিৎসা উপকরণ সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা ৫৫
৫.৩.৪ অ্যাম্বুলেন্স সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা ৫৫
৫.৩.৫ ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধির উপস্থিতি ৫৫
৫.৩.৬ চিকিৎসক ও কর্মচারীদের নির্ধারিত পোশাক/আইডি কার্ড ব্যবহার না করা ৫৫
৫.৩.৭ হাসপাতালে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ/প্রভাব ৫৫
৫.৩.৮ স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা নিয়মিত না হওয়া ৫৬
৫.৩.৯ হাসপাতালের নিরাপত্তা সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা ৫৬
৫.৩.১০ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা ৫৬
৫.৩.১১ স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে সুষ্ঠু চিকিৎসার পরিবেশ ব্যাহত ৫৬
৫.৩.১২ জরুরি প্রয়োজনে অর্থ ব্যয়ের অনুমোদন না থাকা ৫৬
৫.৪ উপসংহার ৫৬

অধ্যায় ছয়: বেসরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা: সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম
৬.১ ভূমিকা ৫৭
৬.২ বেসরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি ৫৭
৬.২.১ অনুমোদনের প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পূরণ না করা ৫৭
৬.২.২ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের দুর্বল তদারকি ৫৮
৬.২.৩ বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের তদারকি কার্যক্রম পরিচালনায় নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায় ৫৮
৬.২.৪ পরামর্শ ফি'র সামঞ্জস্যতা না থাকা ৫৯
৬.২.৫ ডায়াগনস্টিক পরীক্ষার মূল্যের সামঞ্জস্যতা না থাকা ৫৯
৬.২.৬ পরামর্শ ফি'র রশিদ রোগীকে সরবরাহ না করা ৫৯
৬.২.৭ রোগীর ঠিকানা নিবন্ধন না করা ৫৯
৬.২.৮ ভুয়া এবং অতিরিক্ত পেশাগত যোগ্যতা ব্যবহার ৫৯
৬.২.৯ কমিশনভিত্তিক চুক্তি ৬০
৬.৩ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসাসেবার গ্রহণযোগ্যতা ৬০
৬.৩.১ চিকিৎসাসেবার অত্যধিক ব্যয় ৬০
৬.৩.২ মুনাফা-কেন্দ্রিক মানসিকতা ৬০
৬.৪ উপসংহার ৬০

অধ্যায় সাত: উপসংহার ও সুপারিশ
৭.১ উপসংহার ৬১
৭.২ স্বাস্থ্যখাতে সুশাসনের ঘাটতি ৬১
৭.২.১ আইনের অনুপস্থিতি ৬২
৭.২.২ স্বচ্ছতার ঘাটতি ৬৩
৭.২.৩ জবাবদিহিতার ঘাটতি ৬৩
৭.২.৪ সংবেদনশীলতার ঘাটতি ৬৪
৭.২.৫ তদারকির ঘাটতি ৬৪
৭.২.৬ দলীয় রাজনীতিকরণ ৬৪
৭.২.৭ দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার ঘাটতি ৬৪
৭.২.৮ আর্থিক বরাদ্দের স্বল্পতা ৬৪
৭.২.৯ অবকাঠামোগতত দুর্বলতা ৬৪
৭.৩ স্বাস্থ্যখাতে সুশাসনের ঘাটতির প্রভাব ৬৫
৭.৩.১ চিকিৎসার চেয়ে দলীয় রাজনীতিকে অগ্রাধিকার দেওয়া ৬৫
৭.৩.২: চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রতি জনগণের অনাস্থা তৈরি ৬৫
৭.৩.৩ বিদেশে চিকিৎসাসেবা গ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি ৬৫
৭.৩.৪ রোগীদের আর্থিক ক্ষতি ৬৬
৭.৫ সুপারিশ ৬৬

আইন ও নীতি-নির্ধারণী সম্পর্কিত ৬৬
আর্থিক বরাদ্দ সংক্রান্ত ৬৬
মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত ৬৬
সেবা সম্পর্কিত ৬৬
ক্রয়, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কিত ৬৭

তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ৬৮

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১: বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সাধারণ তথ্য ৬৯
পরিশিষ্ট ২: স্বাস্থ্যখাতে সরকারের গৃহিত উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ৭০
পরিশিষ্ট ৩: স্বাস্থ্য অধিদপ্তরাধীন স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে মোট বরাদ্দ ৭১
পরিশিষ্ট ৪: স্বাস্থ্য অধিদপ্তরাধীন ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে জনবলের ক্রমাধিকার ৭২
পরিশিষ্ট ৫: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অর্গানোগ্রাম ৭২
পরিশিষ্ট ৬: সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে সংঘটিত অপ্রীতিকর ঘটনা ৭৩
পরিশিষ্ট ৭: বেসরকারি চিকিৎসায় সরকারি নিবন্ধকৃত ডাক্তারদের পরামর্শ ফি'র নমুনা ৭৪
পরিশিষ্ট ৮: হাসপাতাল অনুযায়ী পরীক্ষার মূল্যের ভিন্নতা ৭৪
পরিশিষ্ট ৯: বদলি ও পদায়ন সংক্রান্ত রিট আবেদনের সংখ্যা ৭৪

সারণির তালিকা

সারণি ২.২: স্বাস্থ্যখাতে অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন ব্যয় (২০০৮-০৯ হতে ২০১৩-১৪ অর্থবছর পর্যন্ত) ২৯
সারণি ২.৩: সরকার এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার অবদান ২৯
সারণি ৩.১: ডাক্তারদের মধ্যে অনুমোদিত পদের বিপরীতে শূন্য জনবল ৩৫
সারণি ৩.২: বিভিন্ন পর্যায়ে মেডিকেল টেকনোলজিস্ট পর্যায়ে শূন্য জনবল (%) ৩৬
সারণি ৩.৩: নার্স পদমর্যাদায় বিভিন্ন শ্রেণিতে জনবল ৩৬
সারণি ৩.৪: স্বাস্থ্যখাতে জনবল ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন খাতে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ের পরিমাণ ৪১
সারণি ৩.৫: পোস্ট গ্রাজুয়েশন কোর্সে সিট সংখ্যা (ডিসেম্বর ২০১২) ৪৩
সারণি ৪.১: উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে ওষুধ ও চিকিৎসা যন্ত্রপাতি খাতে বরাদ্দ ও ক্রয় ক্ষমতা ৪৫
সারণি ৪.২: ঠিকাদারের বিল হতে কমিশন আদায়ের হার ৪৭

চিত্রের তালিকা

চিত্র ২.১: স্বাস্থ্যখাতের কাঠামো ২৪
চিত্র ২.২: জাতীয় বাজেটে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ ও স্বাস্থ্যখাতের মোট জিডিপি ২৮
চিত্র ৩.১: স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীন বিভিন্ন শ্রেণীতে শূন্য জনবল (অনুমোদিত পদের বিপরীতে) ৩৫
চিত্র ৭.১: একনজরে সুশাসনের ঘাটতি: কারণ-ফলাফল-প্রভাব ৬৫

মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দেশব্যাপী দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে নাগরিকদের সচেতন ও সোচ্চার করার জন্য কাজ করছে। জাতীয় পর্যায়ে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সুদৃঢ়তর করণের লক্ষ্যে টিআইবি'র বহুমুখী গবেষণা, প্রচারণা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের পাশাপাশি স্থানীয়ভাবে সেবামূলক খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় সরকারি প্রচেষ্টার সম্পূরক ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে অগ্রাধিকার হিসেবে চিহ্নিত তিনটি খাতের একটি স্বাস্থ্য খাত। স্থানীয় পর্যায়ে এ খাতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নিয়ে গবেষণা ও তার ভিত্তিতে সেবাগ্রহীতাদের অংশগ্রহণে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে টিআইবি।

বাংলাদেশ সরকার স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে অবকাঠামোসহ স্বাস্থ্য জনশক্তি ও চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়ন, এবং সার্বিকভাবে স্বাস্থ্যসেবার সম্প্রসারণমূলক গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম গ্রহণ করে আসছে। এর ফলে স্বাস্থ্যখাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ও সাফল্য অর্জিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও বিভিন্ন গবেষণা, সরকারি প্রতিবেদন ও গণমাধ্যম সূত্রে এ খাতের কার্যক্রমে নানা ধরনের অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতির চিত্র প্রকাশিত হয়। এ প্রেক্ষিতে টিআইবি'র ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এ গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্যখাতের বিদ্যমান সুশাসনের বহুমুখী চ্যালেঞ্জ অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন, এর কারণ ও প্রভাব চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এসব উত্তরণের জন্য সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করা হয়েছে। সরকারসহ স্বাস্থ্যখাতের সংশ্লিষ্ট অংশীজনের বিভিন্ন উদ্যোগে এ প্রতিবেদন সহায়ক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

গবেষণার খসড়া প্রতিবেদনটি ২৮ আগস্ট, ২০১৪ তারিখে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব, মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থাপন করা হয়। তাঁদের মূল্যবান মতামতের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি হালনাগাদ করা হয়। মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এ ধরনের সহযোগিতার জন্য তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। তাছাড়া এ খাতের বিভিন্ন অংশীজন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে গবেষণাটি সমৃদ্ধ করতে মূল্যবান অবদান রেখেছেন। তাঁদেরকেও আন্তরিক ধন্যবাদ।

টিআইবি'র গবেষক তাসলিমা আক্তার গবেষণাটি পরিচালনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছেন। গবেষণার তত্ত্বাবধান করেছেন শাহজাদা এম আকরাম। এছাড়া টিআইবি'র উপ-নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের ও গবেষণা বিভাগের পরিচালক রফিকুল হাসান এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে গবেষণা ও অন্যান্য বিভাগের সহকর্মীরা মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করেন। তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

আমরা আশা করি এই প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য ও বিশ্লেষণ স্বাস্থ্যখাতের সুশাসনের সমস্যা সম্পর্কে সম্যক ধারণা দিতে সক্ষম হবে, এবং বিদ্যমান সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য দিক-নির্দেশনা হিসেবে অবদান রাখতে পারবে।

এই প্রতিবেদনের পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও সংশোধনে যেকোনো পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

স্বাস্থ্য খাতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়[১]

সার-সংক্ষেপ

১.১ প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সনদ ও ঘোষণার লক্ষ্য অর্জনে স্বাক্ষরদাতা দেশ হিসেবে এবং জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে ২০১৫ সালের মধ্যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অনুসারে জনস্বাস্থ্যের কয়েকটি ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে স্বাস্থ্যখাতকে প্রাধান্য দিয়ে নির্বাচনী ইশতেহারেও ধারাবাহিক রাজনৈতিক অঙ্গীকার করা হয়। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ (অবকাঠামো, স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণ, স্বাস্থ্য জনশক্তি, চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থা, চিকিৎসা সেবা ব্যবস্থায় প্রযুক্তির প্রবর্তন প্রভৃতি) গ্রহণ করে। এ প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্যখাতের কয়েকটি সূচকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে এবং বাংলাদেশ সরকার পুরস্কারও অর্জন করে। যেমন, শিশু মৃত্যুর হার প্রত্যাশিত পর্যায়ে কমিয়ে আনতে সক্ষম হওয়ায় (এমডিজি-৪) জাতিসংঘ কর্তৃক বাংলাদেশকে পুরস্কৃত, টিকাদানের মাধ্যমে শিশু মৃত্যুহার কমানোর কর্মসূচিতে অসামান্য সাফল্যে বাংলাদেশ *গ্লোবাল এলায়েন্স ফর ভ্যাকসিনস অ্যান্ড ইম্যুনাইজেশন (গাভী)* পুরস্কার লাভ করে।

এ খাতে সাফল্য থাকা সত্ত্বেও রয়েছে সুশাসনের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ যা স্বাস্থ্য সম্পর্কিত টিআইবি'র জরিপ প্রতিবেদন (বেইজলাইন, রিপোর্ট কার্ড, জাতীয় খানা জরিপের অধীনে স্বাস্থ্যসেবার ওপর জরিপ, জাতীয় পর্যায়ের হাসপাতালের ওপর ডায়াগনস্টিক ও ফলো-আপ গবেষণা), বিশেষজ্ঞদের মতামত, এবং গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে ফুটে ওঠে। টিআইবি পরিচালিত জাতীয় খানা জরিপ ২০১২ অনুযায়ী সরকারি স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণকারী খানার ৪০.২% সেবা গ্রহণে অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয় এবং জাতীয়ভাবে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণকারী খানাগুলো বিভিন্ন সেবা পেতে মোট ৭০.৩ কোটি টাকা নিয়ম বহির্ভূতভাবে দেয় বা দিতে বাধ্য হয়। এছাড়া গণমাধ্যমে এবং অন্যান্য প্রকাশিত প্রতিবেদনে ডাক্তারদের উপস্থিতি, সেবার মান, শয্যা, ওষুধ প্রাপ্তি, পথ্যের মান, বেসরকারি চিকিৎসায় অনিয়ম, দালালের উপস্থিতি, হাসপাতাল সংশ্লিষ্টদের বিভিন্ন আর্থিক দুর্নীতি প্রভৃতি ধরনের তথ্য সম্পর্কে জানা যায়।

চিকিৎসাসেবায় সার্বিকভাবে সুশাসনের সমস্যা বিশেষত অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন, মাত্রা, কারণ, প্রভাব ও সেবার মান নিয়ে গবেষণার ঘাটতি এবং টিআইবি'র কার্যক্রমে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত তিনটি খাতের একটি স্বাস্থ্য এবং এ খাতের ওপর ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বর্তমান গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি

এ গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য স্বাস্থ্যখাতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা এবং তা থেকে উত্তরণে সুপারিশ প্রণয়ন করা। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য-

১. চিকিৎসাসেবা ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আইনি, কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা; এবং
২. চিকিৎসাসেবায় বিরাজমান অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন ও মাত্রা চিহ্নিত করা, এবং তার কারণ ও প্রভাব বিশ্লেষণ করা।

উপরের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি হাসপাতালসমূহে চিকিৎসাসেবাদানকারী ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা (অবকাঠামো, বাজেট, জনবল), সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের জনবল ব্যবস্থাপনা (নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ), সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের ক্রয়, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা, সরকারি ও বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের সেবা কার্যক্রম, এবং বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের তদারকি ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

১.৩ গবেষণা পদ্ধতি

- এটি একটি গুণগত তথ্যভিত্তিক গবেষণা। পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ উভয় উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎস হতে গুণগত তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গুণগত তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতির মধ্যে ছিল মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার ও দলীয় আলোচনা। গবেষণায় মুখ্য তথ্যদাতার ধরনের মধ্যে রয়েছে, চিকিৎসাসেবা প্রদানকারী ব্যক্তি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী, পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধি, এবং গণমাধ্যম কর্মী।
- পরোক্ষ উৎসের মধ্যে রয়েছে টিআইবি'র জাতীয় খানা জরিপ ২০১২; যেখানে ৬৪টি জেলায় সরকারি স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণকারী মোট খানা ছিল ৩,২০৮ এবং ২৮টি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের ওপর (উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৩টি, জেলা সদর হাসপাতাল

[১] ২০১৪ সালের ছয় নভেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থাপিত গবেষণা প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ

২৩টি, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ২টি) ২৮টি রিপোর্ট কার্ড জরিপ; যেখানে মোট উত্তরদাতা ছিল ১৪,২৭৬। এছাড়াও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত অন্যান্য গবেষণা প্রতিবেদন, টিআইবি'র স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ সভা; যেখানে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, স্থানীয় নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ও সাবেক স্বাস্থ্য মন্ত্রীসহ জাতীয় পর্যায়ের নীতি-নির্ধারক শীর্ষ কর্মকর্তাদের উপস্থিতি ছিল, স্বাস্থ্যখাত সংশ্লিষ্ট নীতি ও আইন, জাতীয় বাজেট, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত প্রতিবেদন, ওয়েবসাইট, নিরীক্ষা প্রতিবেদন, গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন ইত্যাদি। এছাড়াও বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্যের সত্যতা যাচাই করা হয়েছে। নভেম্বর ২০১৩-আগস্ট ২০১৪ পর্যন্ত এ গবেষণার তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের কাজ সম্পন্ন করা হয়।

- গবেষণার খসড়া প্রতিবেদনটি ২৮ আগস্ট, ২০১৪ তারিখে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব, মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তা ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের উপস্থিতিতে উপস্থাপন করা হয়। তাদের মূল্যবান মতামতের ভিত্তিতে খসড়া গবেষণা প্রতিবেদনটি হালনাগাদ করা হয়।

২ গবেষণার পর্যবেক্ষণ

২.১ আইনি কাঠামোতে সীমাবদ্ধতা ও প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ

- সকলের জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে সরকার জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ চূড়ান্ত করেন। জাতীয় স্বাস্থ্যনীতিতে উল্লিখিত মূল লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে কর্মকৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। এ সকল কর্মকৌশলের কিছু কিছু কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যুগোপযোগী আইন/বিধিমালা তৈরির ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে। যেমন, অনুচ্ছেদ ১৪ অনুযায়ী স্বাস্থ্যসেবার সাথে সম্পৃক্ত সকলের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য নীতিমালা বা আইন প্রণয়ন করার কথা বলা হলেও তা গ্রহণে উদ্যোগের অভাব রয়েছে, অনুচ্ছেদ ১৬ অনুযায়ী বেসরকারি পরীক্ষা-নিরীক্ষাসহ অন্যান্য চিকিৎসা ব্যয় সহনীয় পর্যায়ে রাখার ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হলেও এখনো কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয় নি, এবং অনুচ্ছেদ ২৩ অনুযায়ী সকল স্তরের হাসপাতাল বর্জ্যের নিরাপদ, পরিবেশবান্ধব ও ব্যয়সাশ্রয়ী ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা সম্পর্কে বলা হলেও এ বিষয়ে অগ্রগতি খুব সামান্য।

- চিকিৎসকের অবহেলার কারণে কোনো রোগীর মৃত্যু বা ক্ষতি হলে তাঁর বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে আইনের যেমন সীমাবদ্ধতা রয়েছে, তেমনি কোড অব মেডিকেল এথিকস-এর ধারা ৫ (এ) অনুযায়ী অভিযুক্ত ডাক্তারদের বিরুদ্ধে নিবন্ধন বাতিল সম্পর্কে নির্দেশনা থাকলেও এর বাস্তবায়ন খুবই সীমিত।

- দি মেডিকেল প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্রাইভেট ক্লিনিক অ্যান্ড ল্যাবরেটরিজ (রেগুলেশন) (অর্ডিন্যান্স) ১৯৮২- আইনের ধারা ১১ (১)-এ নিবন্ধিত ডাক্তারদের চেম্বার ও বেসরকারি ক্লিনিক বিধি অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে কিনা বা বিধি অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা তা মহাপরিচালক (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর) অথবা তার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনের কথা উল্লেখ থাকলেও পরিদর্শন কার্যক্রমের পর্যায়কাল সম্পর্কে উল্লেখ করা হয় নি। এতে ক্লিনিকগুলো নিয়মিত নির্দিষ্ট সময় অন্তর পরিদর্শন হয় না। উক্ত আইনের ধারা ৩, শিডিউল এ (২)-তে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মূল্য সম্পর্কে বলা হলেও কিছু কিছু পরীক্ষার মূল্য বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে বাস্তবসম্মত নয়। যেমন, ইএসআর-৮ টাকা, হিমোগ্লোবিন-৮ টাকা, ব্লাড ক্রিয়েটিনিন-৩০ টাকা। এই আইনের কয়েকটি ধারায় পরবর্তীতে সংশোধনী আনা হলেও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মূল্য সম্পর্কিত কোনো সংশোধনী আনা হয় নি। এতে বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলো নিজ নিজ মর্জিমাফিক ফি নির্ধারণ করে রোগীর কাছ হতে অতিরিক্ত মূল্য আদায় করছে এবং প্রতিষ্ঠানভেদে মূল্যের ব্যাপক তারতম্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। উক্ত আইনের ধারা ১৩ (২)-এ বেসরকারি ক্লিনিক আইনের কোনো ধারা লঙ্ঘনজনিত শাস্তি সর্বোচ্চ ছয় মাসের কারাবাস বা পাঁচ হাজার টাকা অথবা উভয়ই উল্লেখ করা হয়। এ প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞরা বলেন, যেহেতু আইনটি অনেক পুরাতন, সেহেতু শাস্তির পরিমাণ কম হওয়ায় আইনের বিভিন্ন ধারা লঙ্ঘনের প্রবণতা অব্যাহত থাকে এবং দুর্নীতি ও অনিয়মের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

- দি মেডিকেল প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্রাইভেট ক্লিনিকস্ অ্যান্ড ল্যাবরেটরিজ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অর্ডিন্যান্স ১৯৮৪- সংশোধনীর ধারা ৫ এর মাধ্যমে ১৯৮২ সালের অর্ডিন্যান্সে নিবন্ধিত মেডিকেল প্র্যাকটিশনারদের পরামর্শ ফি বাতিল করা হয়। ফলে পরামর্শ ফি'র কোনো উর্ধ্বসীমা না থাকায় ডাক্তার ভেদে সুনির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন ছাড়া উচ্চ ফি আদায়ের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। সংশোধনীর ধারা ৪ এর দ্বারা ১৯৮২ সালের অর্ডিন্যান্সের ধারা ৭-এ বেসরকারি চিকিৎসায় পরামর্শ ফি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মূল্যের তালিকা ক্লিনিকগুলোতে দৃষ্টিগোচর স্থানে প্রদর্শনে বাধ্যবাধকতার (ডিম্যান্ডেড আন্ডার দিস অর্ডিনেন্স) বিষয়টি শিথিল (ডিম্যান্ডেড বাই হিম অর ইট) করা হয়। এতে পরামর্শ ফি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মূল্য সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদের পূর্ব থেকে জানার সুযোগ থাকে না।

- গণকর্মচারী শৃঙ্খলা (নিয়মিত উপস্থিতি) অধ্যাদেশ, ১৯৮২-এই অধ্যাদেশের ধারা ৪, ৫, ও ৬-এ বিনানুমতিতে কাজে অনুপস্থিতির জন্য দণ্ড, অফিস ত্যাগের জন্য দণ্ড এবং বিনানুমতিতে বিলম্বে উপস্থিতির জন্য দণ্ড রয়েছে। বাস্তবে এই সকল ধারার প্রয়োগ সীমিত।

২.২ আর্থিক সীমাবদ্ধতা

- **জাতীয় বাজেটে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দের হার:** স্বাস্থ্য খাতের কয়েক বছরের জাতীয় বাজেট পর্যালোচনায় দেখা যায়, শতকরা হিসাবে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দের হার ক্রমান্বয়ে কমছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে যা ছিল ৬.৫৮%, ২০১৩-২০১৪ অর্থ-বছরে তা কমে দাড়ায় ৪.৬০%।

  স্বাস্থ্য খাতে জিডিপি'র সাপেক্ষে বরাদ্দ: বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে, ভালো মানের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য স্বাস্থ্যখাতে কমপক্ষে যেখানে জিডিপি'র ৫ শতাংশ বরাদ্দ করা প্রয়োজন, সেখানে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতে জিডিপি'র সাপেক্ষে বরাদ্দ এক শতাংশ বা তারও কম। ২০০৮-০৯ অর্থ-বছরে এই হার ছিল ১.০০%, ২০১৩-২০১৪ অর্থ-বছরে তা কমে দাড়ায় ০.৮৪%।
- **স্বাস্থ্যসেবায় খরচ:** সরকারের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্যসেবায় জনপ্রতি বরাদ্দ বছরে ৩৯০ টাকা, যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাবে ২,৬৫২ টাকা হওয়া উচিত।
- **উন্নয়ন ব্যয়ের হার:** স্বাস্থ্যখাতে মোট বরাদ্দে উন্নয়ন ব্যয়ের হার ক্রমান্বয়ে কমছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে মোট বরাদ্দের ৪১.৪% থেকে কমে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে দাড়ায় ৩৮.৩%-এ।
- **কর্মসূচিতে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার অবদান:** স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা খাতের তিনটি কর্মসূচিতে (১৯৯৮-২০০৩, ২০০৩-২০১১, ২০১১-২০১৬) বরাদ্দকৃত তহবিলের বিপরীতে সরকারের বরাদ্দ ক্রমান্বয়ে বাড়লেও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার অবদান ক্রমান্বয়ে কমছে। উক্ত সময়ে সরকারের অবদান ৬২% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দাড়ায় ৭৬% এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার অবদান ৩৮% থেকে কমে দাড়ায় ২৪%।
- **স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে অর্থ ব্যয়ের ক্ষমতা:** সদর হাসপাতালের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয় তার ব্যবহারের পূর্ণ ক্ষমতা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নেই। হাসপাতালের চিকিৎসাসামগ্রী জরুরি প্রয়োজনে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, অবকাঠামো সংস্কার ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য অর্থ খরচ করার ক্ষমতা সিভিল সার্জনেরও নেই। তাছাড়া হাসপাতালের লাইট, ফ্যান, সুইচ ইত্যাদি মেরামতের ক্ষমতা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নেই।
- **স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন পরিচালনায় অর্থ:** স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে দৈনন্দিন পরিচালনায় প্রয়োজনের তুলনায় বরাদ্দের স্বল্পতা রয়েছে যার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে অ্যাম্বুলেন্স ও জেনারেটর, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণে, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমে।

২.৩ প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা

২.৩.১ প্রয়োজনের তুলনায় মানবসম্পদের স্বল্পতা

- স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জনবল পর্যালোচনায় দেখা যায়, মোট অনুমোদিত জনবলের (১,১৫,৯৩৫) বিপরীতে পদের শূন্যতা রয়েছে ২২,৬১৮ (২০%)। অনুমোদিত জনবলের বিপরীতে সবচেয়ে বেশি পদ শূন্য রয়েছে নন-ডাক্তার মর্যাদাসম্পন্ন কর্মকর্তাদের যা ৫৬% (২৭৪ জন)। এরপরেই রয়েছে প্রথম শ্রেণীর ডাক্তার মর্যাদায় যা ২৮% (৬,১৯৮ জন)। স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে মেডিকেল টেকনোলজিস্ট এবং মাঠ পর্যায়ে ডমিসিলিয়ারি স্টাফ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন। মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের অনুমোদিত পদের (৬,৪২৮) বিপরীতে শূন্য পদ ২১% (১,৩৩২) এবং ডমিসিলিয়ারি স্টাফদের অনুমোদিত পদের বিপরীতে শূন্য পদ ৮.৯% (২,৩৫০)। বিভিন্ন পর্যায়ে জনবলের যেমন শূন্যতা রয়েছে, তেমনি বিদ্যমান জনবলের অনুপাত বিশ্ব মানদণ্ড অনুপাতে নয়। যেখানে আন্তর্জাতিকভাবে ডাক্তার ও নার্সের স্বীকৃত অনুপাত ১:৩, বাংলাদেশে এ অনুপাত ১:০.৪। বাংলাদেশে নার্স ও শয্যা সংখ্যার অনুপাত ১:১৩; যা স্বীকৃত অনুপাত প্রতি শিফটে সাধারণ শয্যায় ১:৪ ও স্পেশালাইজড শয্যায় ১:১। এছাড়া বাংলাদেশে প্রতি ৩,২৯৭ জনের জন্য একজন ডাক্তার (আন্তর্জাতিক স্বীকৃত অনুপাত ১:৬০০), প্রতি ১১,৬৯৬ জনের জন্য একজন নার্স, এবং প্রতি ২৭,৮৪২ জনের জন্য রয়েছে একজন মেডিকেল টেকনোলজিস্ট।

২.৩.২ জনবল পদায়ন সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা

- স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে জনবল পদায়ন দেওয়া হলেও কিছু ক্ষেত্রে অনুমোদিত পদগুলোতে পদায়ন দেওয়া হয় নি বলে গবেষণায় দেখা যায়। যেমন, এ শ্রেণীর ৬৪টি জেলার মধ্যে ২৬টি জেলায় ডেপুটি সিভিল সার্জন পদ তৈরী করা হলেও ছয়টি জেলায় উক্ত পদে পদায়ন নেই, জেলা পর্যায়ের হাসপাতালের জন্য তত্ত্বাবধায়ক পদ সৃষ্টি করা হলেও চারটি প্রতিষ্ঠানে উক্ত পদে পদায়ন নেই, এবং উপজেলা পর্যায়ে ৪৮৩টি ইউএইচএফপিও পদের মধ্যে ১১টি উপজেলায় উক্ত পদে পদায়ন দেওয়া হয় নি।

২.৩.৩ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনায় দীর্ঘসূত্রতা

- মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনায় পদোন্নতির ক্ষেত্রে, সিলেকশন গ্রেড দেওয়ার ক্ষেত্রে, এবং চলতি দায়িত্ব পদটি নিয়মিতকরণে বিলম্ব হয়। প্রশাসনিক পর্যায়ে কর্মরত চিকিৎসকদের পদোন্নতিতে দীর্ঘসূত্রতা বিদ্যমান, তেমনি প্রশাসনিক এবং শিক্ষকতা

মর্যাদায় চলতি দায়িত্ব পদটি নিয়মিতকরণেও বিলম্ব হয়। চলতি দায়িত্ব পদটি ছয় মাসের মধ্যে নিয়মিতকরণ করা হবে বলা হলেও এটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে করা হয় না। আবার চলতি দায়িত্ব হিসেবে যে অভিজ্ঞতায় বেশি তাকে দেওয়ার কথা থাকলেও কিছু ক্ষেত্রে জুনিয়রকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়।

- স্বাস্থ্য অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন পর্যায়ে জনবল শূন্যতার পিছনে রয়েছে নিয়োগ প্রদানে দীর্ঘ প্রক্রিয়া। যেমন, স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে জনবলের অনুমোদন পেতে আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতায় (স্বাস্থ্য, জনপ্রশাসন, এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে) অনুমোদন পেতে যেমন অনেক বেশি সময় লাগে, আবার কোনো ক্ষেত্রে অনুমোদন পাওয়া যায় না। এছাড়া নিয়োগে দলীয়করণ, অনিয়ম ও দুর্নীতি সংঘটনে রীট হলে শূন্য পদগুলো পূরণে বিলম্ব হয়। অধিকন্তু অবসর, মৃত্যু, চাকরি ছেড়ে দেওয়া, এবং নতুন পদ সৃষ্টি হওয়া প্রভৃতি ক্ষেত্রেও পদের শূন্যতা সৃষ্টি হয়।
- চাহিদা সাপেক্ষে হাসপাতালগুলোতে রোগী ও শয্যা অনুপাতে ডাক্তার, নার্সসহ অন্যান্য পদে জনবলের যেমন ঘাটতি রয়েছে, তেমনি নতুনভাবে জনবল নিয়োগের বিষয়টি যাচাই না করে নতুন বিভাগ খোলা এবং শয্যা সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে।
- বাংলাদেশের সকল সরকারি হাসপাতালের মেডিকেল যন্ত্রপাতি মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও স্থাপনের দায়িত্বে রয়েছে নিমিউ। এ সকল যন্ত্রপাতি মেরামতে নিমিউতে যেমন জনবলের অপর্যাপ্ততা রয়েছে, তেমনি দক্ষ জনবলেরও ঘাটতি রয়েছে।

২.৩.৪ প্রশিক্ষণে সীমাবদ্ধতা

চাহিদার প্রেক্ষিতে বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের ঘাটতি: দেশে রাষ্ট্রীয় চাহিদার প্রেক্ষিতে কোন বিষয়ে কতজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার প্রয়োজন এটি মূল্যায়ন করা হয় নি। তাছাড়া চাহিদার প্রেক্ষিতে বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের ঘাটতি রয়েছে। বিসিপিএস ২০১১-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দেশে অবসটেট্রিকস অ্যান্ড গাইনোকোলজিতে ৩৪৯ জন ডাক্তারের জন্য সিট থাকলেও অ্যানেসথেসিওলজিতে এই সংখ্যা ৪৫ জন। চিকিৎসা সেবায় অ্যানেসথেটিস্ট সংকটের কারণে হাসপাতালগুলোতে রোগীদের অপেক্ষা করতে হয়।

উচ্চশিক্ষায় প্রশিক্ষণ থাকাকালীন বেসরকারি চিকিৎসা চর্চা: উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য চাকরি থেকে প্রেষণে থাকার সময় প্রাইভেট প্র্যাকটিস করা থেকে বিরত থাকার কথা বলা হলেও এর ব্যত্যয় ঘটে।

উচ্চতর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসকদের দক্ষতার উপযুক্ত ব্যবহারে দুর্বলতা: একজন চিকিৎসক জুনিয়র কনসালটেন্ট (সার্জারি) হওয়ার পর পদায়ন দেওয়া হয় উপজেলায়। কিন্তু উপযুক্ত লজিস্টিক ও সহায়ক জনবল না থাকার কারণে (যেমন- এনেসথেটিস্ট না থাকা, ওটিতে যন্ত্রপাতি পরিচালনায় দক্ষতাসম্পন্ন জনবল না থাকা ইত্যাদি) উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণটি কাজে লাগানোর সুযোগ কম।

প্রশিক্ষণের অনুমতির ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের দীর্ঘসূত্রতা: কোনো ডাক্তার কোনো একটি বিশেষ বিষয়ে দেশের বাইরে প্রশিক্ষণ গ্রহণে অংশগ্রহণে অনুমতির জন্য মন্ত্রণালয়ে আবেদন করলে নির্ধারিত সময়ে তিনি ছুটি পান না। যখন ছুটির অনুমতি দেওয়া হয়, তখন ঐ প্রশিক্ষণের সময় শেষ হয়ে যায় এবং ডাক্তার উক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়

২.৩.৫ তদারকি ও জবাবদিহি ব্যবস্থা

উচ্চশিক্ষায় তদারকি ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা: উচ্চশিক্ষায় প্রশিক্ষণার্থীদের তদারকি ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা রয়েছে। একজন প্রশিক্ষণার্থী নিয়মিত ক্লাশে উপস্থিত হচ্ছেন কিনা, প্রতিদিন কী কাজ করছেন, ওটিতে কতগুলো দক্ষতাসম্পন্ন কাজ করছেন সেগুলোর যথাযথ তদারকিতে শিক্ষকদের দিক থেকে যেমন ঘাটতি রয়েছে, অন্যদিকে শিক্ষক নিয়মিত ক্লাস নিচ্ছেন কিনা সে বিষয়গুলোও যথাযথভাবে তদারকি করার জন্য কোনো কর্তৃপক্ষ কার্যকর ভূমিকা পালন করে না।

উপস্থিতি কার্যক্রমে তদারকি ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা: ডাক্তারদের নির্দিষ্ট সময়ে হাসপাতালে উপস্থিত না হওয়া ও নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে হাসপাতাল ত্যাগ করলে তার জন্য কোনো জবাবদিহি করতে হয় না। অন্যদিকে, কর্মচারীদের উপস্থিতি ও কাজের ক্ষেত্রেও যথাযথ তদারকি ও জবাবদিহিতায় ঘাটতি রয়েছে।

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের তদারকি ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা: বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলো অর্ডিন্যান্সের শর্তাবলী পূরণ করে যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে কি না এক্ষেত্রে নিয়মিত ও যথাযথ তদারকি ব্যবস্থাপনায় যথেষ্ঠ দুর্বলতা দেখা যায়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হাসপাতাল ও ক্লিনিক শাখায় ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে প্রায় আট হাজারের অধিক প্রতিষ্ঠান তদারকির দায়িত্বে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হাসপাতাল ও ক্লিনিক শাখা জনবলের অপর্যাপ্ততা রয়েছে।

অবকাঠামো ও লজিস্টিকস

হাসপাতালগুলোতে চাহিদার তুলনায় শয্যার স্বল্পতা রয়েছে। যে কারণে রোগীরা অনেক ক্ষেত্রে ভর্তির সাথে সাথে শয্যা পায় না। জানা যায়, প্রতি ১,৬৯৯ জনের জন্য শয্যা রয়েছে একটি। ডাক্তারদের জন্য পর্যাপ্ত আবাসন সুবিধা নেই; যেগুলো আছে সেগুলোর অধিকাংশই বসবাসের উপযোগী নয়। উপজেলা পর্যায়ে এই সমস্যাটি প্রকট। উপজেলা পর্যায়ে ডাক্তারদের বসার জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় স্থাপনা (চেয়ার, টেবিল, কক্ষ, টয়লেট ইত্যাদি) নেই। নার্স এবং কর্মচারীদের জন্য পর্যাপ্ত আবাসন ব্যবস্থা নেই, জরুরি প্রয়োজনে চিকিৎসকদের যানবাহনের সুবিধা নেই, অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের জন্য পৃথক টিকিট কাউন্টার, এবং নারী রোগীর জন্য বহির্বিভাগে পৃথক বসার ব্যবস্থা নেই। জেলা সদর হাসপাতালে সিসিইউ, আইসিইউ, সিটি স্ক্যান যন্ত্র, এবং লিফট নেই। নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা নেই। বিশেষ করে উপজেলা পর্যায়ে এই সমস্যাটি প্রকট। জেনারেটর থাকলেও তা চালানোর জন্য জ্বালানী তেলের বরাদ্দ পর্যাপ্ত নেই।

২.৩.৭ ওষুধ ও চিকিৎসা উপকরণ: হাসপাতালে মজুদকৃত ষুধের তালিকা কোনো কোনো ক্ষেত্রে যেমন টানানো হয় না, তেমনি নিয়মিত তা হালনাগাদও করা হয় না। অধিকাংশ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এক্স-রে যন্ত্র সচল থাকে না। এছাড়াও আলট্রাসনোগ্রাম, এক্স-রে ফিল্ম ও ইসিজি যন্ত্রের অভাব রয়েছে। জেলা সদর হাসপাতালগুলোতে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জামের অভাব রয়েছে; বিশেষ করে ডিজিটাল এক্স-রে, ইকো-কার্ডিয়াক, মাইক্রোস্কোপ প্রভৃতি ধরনের যন্ত্র।

২.৩.৮ অ্যাম্বুলেন্স সুবিধা: হাসপাতালগুলোতে যেমন অ্যাম্বুলেন্সের অপর্যাপ্ততা রয়েছে, তেমনি অনুমোদিত অ্যাম্বুলেন্সের সবগুলো সচল নয়। পর্যালোচনায় দেখা যায়, অধিকাংশ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে একটি সচল অ্যাম্বুলেন্স এবং জেলা সদর হাসপাতালে দুটি সচল অ্যাম্বুলেন্স রয়েছে। সরকারি হাসপাতালগুলোতে অ্যাম্বুলেন্সের অপর্যাপ্ততায় রোগীদের একটি অংশ বেসরকারী অ্যাম্বুলেন্স সুবিধা গ্রহণ করে থাকে। এগুলোর বেশিরভাগের মালিকানা হাসপাতালে কর্মরত তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীর। তারা তাদের বেসরকারি অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া নেওয়ার জন্য রোগীদের উদ্বুদ্ধ করে এবং নির্ধারিত ভাড়ার অতিরিক্ত আদায় করে থাকে।

২.৩.৯ স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে সুষ্ঠু চিকিৎসার পরিবেশ ব্যাহত

ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিদের নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে হাসপাতালে উপস্থিতি: ওষুধ কোম্পানীর প্রতিনিধিদের হাসপাতালের অভ্যন্তরে ডাক্তারের কক্ষে প্রবেশে সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট দিন ও সময় বেধে দিলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা মানা হয় না। এতে ডাক্তারের দিক থেকেও প্রশ্রয় রয়েছে।

বিভিন্ন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনায় হাসপাতালের সেবা কার্যক্রম মাঝে মাঝে বাধাগ্রস্ত হয়: হাসপাতাল অভ্যন্তরে রোগী মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে রোগীর আত্মীয়-স্বজন এবং হাসপাতালের ডাক্তার ও কর্মীদের সাথে অপ্রীতিকর ঘটনা, স্থানীয় প্রভাবশালীর সাথে চিকিৎসকদের বিভিন্ন বিষয়ের বাকবিতণ্ডায় প্রভাবশালী কর্তৃক চিকিৎসক ও কর্মচারীদের ওপর হামলা, শিক্ষানবিশ চিকিৎসকের সাথে রোগীকে কেন্দ্র করে এবং সেবা সম্পর্কিত প্রতিবেদন সংগ্রহে গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে শিক্ষানবীশ চিকিৎসকদের সংঘর্ষের ঘটনায় হাসপাতালে মাঝে মাঝে রোগীর চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম বাঁধাগ্রস্ত হয়।

হাসপাতালে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ/প্রভাব: হাসপাতালগুলোতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বা প্রভাবশালীদের হস্তক্ষেপ/প্রভাব বিদ্যমান রয়েছে। বিশেষ করে মারামারি করে আসা রোগীরা কেস করার জন্য তাদের পক্ষে মেডিকেল সার্টিফিকেট পেতে অনেক সময় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বা তাদের প্রভাবশালী আত্মীয়-স্বজন অনৈতিক হস্তক্ষেপ করে। অনেক ক্ষেত্রে রোগী স্থানীয় প্রভাব খাটিয়ে হাসপাতালের পেয়িং শয্যায় বিনা পয়সায় থাকেন।

হাসপাতাল অভ্যন্তরে দালাল দ্বারা হয়রানির শিকার: সব পর্যায়ের হাসপাতালেই দালালদের সক্রিয় উপস্থিতি রয়েছে। অনেকক্ষেত্রে রোগীরা আর্থিক বিনিময়ে দালালের নিকট হতে সহায়তা পেয়ে থাকে, আবার সহায়তার পরিবর্তে হয়রানিও হয়ে থাকে। পাশাপাশি কর্মচারীদের দ্যোরাত্মও অনেকক্ষেত্রে হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসার পরিবেশ ব্যহত করে।
রোগীর সাথে অধিক সংখ্যক ভিজিটর থাকায় হাসপাতালের ব্যবস্থাপনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিরাপত্তা কর্মী না থাকায় হাসপাতালের সার্বিক নিরাপত্তাও বিঘ্নিত হয়।

২.৩.১০ তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা: রোগীদের তথ্য সরবরাহে তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তথ্য ও অনুসন্ধান কেন্দ্র নেই, অভিযোগ বাক্স নেই, কর্তব্যরত ডাক্তারদের তালিকা টানানো নেই, এবং নাগরিক সনদ টানানো নেই।

২.৩.১১ স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রম: হাসপাতালের সেবার মান উন্নয়নে হাসপাতালের বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং ডাক্তারদের কর্মস্থলে উপস্থিতি নিশ্চিতকরণে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু দেখা যায়, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিয়মিত হয় না। যার প্রেক্ষিতে কমিটি স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে না।

২.৩.১২ মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ, ও অন্যান্য: অ্যাম্বুলেন্স মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণে রয়েছে ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট মেইনটেনেন্স অর্গানাইজেশন (টেমো)। টেমোতে রাজস্ব খাতের সকল গাড়ি মেরামত করা হয়। দেখা যায়, জনবলের স্বল্পতায় বিকল অ্যাম্বুলেন্স মেরামত হতে দীর্ঘ সময় লাগে। অন্যদিকে চিকিৎসকদের আবাসন নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না এবং পণ্য রক্ষণাবেক্ষণে স্টোরেজ ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা রয়েছে। বিশেষ করে উপজেলা পর্যায়ে এই সমস্যাটি প্রকট। ঠিকাদার কর্তৃক সরবরাহকৃত পথ্যের গুণগত ও পরিমাণগত মান নিয়ন্ত্রণে হাসপাতালগুলোতে তদারকি ব্যবস্থাপনা কমিটি কার্যকর নয়।

৩.১ অনিয়ম ও দুর্নীতি: প্রাতিষ্ঠানিক কাজ সম্পাদন করার ক্ষেত্রে মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ নিয়োগ, বদলি, পদায়ন, পদোন্নতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ সম্পর্কিত সীমাবদ্ধতা, দুর্নীতি ও অনিয়মের চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হল।

৩.১.১ নিয়োগ সম্পর্কিত অনিয়ম ও দুর্নীতি

- অ্যাডহক চিকিৎসক ও কর্মচারী নিয়োগে দুর্নীতি ও অনিয়ম সংঘটিত হয়। নিয়োগে দলীয় তদবিরের পাশাপাশি নিয়ম-বহির্ভুত অর্থের লেনদেন হয়। তাছাড়া স্বাস্থ্য অধিদপ্তরাধীন উপজেলা, জেলা, এবং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলোতে কর্মচারী নিয়োগেও দুর্নীতি ও অনিয়ম সংঘটিত হয়। এ সকল নিয়োগে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে অতিরিক্ত নিয়োগ প্রদানের প্রচেষ্টা করা হয় এবং নিয়োগ প্রদানের আশ্বাসে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ের অভিযোগ রয়েছে।
- অ্যাডহক চিকিৎসক ও কর্মচারী নিয়োগে সুপারিশ ও অর্থ লেনদেন হয় স্বাচিপ/স্থানীয় পর্যায়ে দলীয় নেতা, কর্মচারী ইউনিয়ন নেতা, অফিস প্রধান সহকারী, হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের একাংশের মধ্যে।

৩.১.২ বদলি সম্পর্কিত অনিয়ম ও দুর্নীতি: ডাক্তারদের প্রতি ষ্টেশনে চাকরিকাল তিন বছর এবং দুর্গম ও পার্বত্য অঞ্চলে দুই বছর থাকার নিয়মটি মানা হয় না। দলীয় রাজনৈতিক প্রভাব, তদবির ও নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ লেনদেনের মাধ্যমে বদলি নেওয়া হয়। কর্মচারীদের মধ্যে বদলি নিতে আগ্রহী প্রার্থী তদবির এবং নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ প্রদানের মাধ্যমে পছন্দমতো স্থানে বদলি নিয়ে থাকেন। অন্যদিকে, কর্মচারীরা দীর্ঘদিন একই জায়গায় অবস্থানের প্রেক্ষিতে তাদের মধ্যে শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠে। পরবর্তীতে হাসপাতালের প্রশাসনিক কার্যক্রম থেকে শুরু করে চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে এবং দুর্নীতি ও অনিয়মের সাথে সম্পৃক্ত থাকে। বদলিতে অর্থের লেনদেন হয় সিভিল সার্জন অফিস ও অধিদপ্তর পর্যায়ে।

৩.১.৩ পদোন্নতি সম্পর্কিত অনিয়ম ও দুর্নীতি: ডিপিসি এবং এসএসবি'র মাধ্যমে পদোন্নতিতে দলীয় তদবির প্রাধান্য পায়। ডিপিসি'র মাধ্যমে পদোন্নতিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঘুষের লেনদেন হয়। পদোন্নতিতে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ নির্ভর করে পদবী, পদবীর সংখ্যা, কোন বিষয়ে পদোন্নতিপ্রাপ্ত হবেন তার ওপর। ডিপিসির মাধ্যমে পদোন্নতিতে যে ধরনের অনিয়ম করা হয় - চাকরির অভিজ্ঞতা ও জ্যেষ্ঠতা বিবেচনা না করা, উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতা বিবেচনা না করা, প্রকাশনাকে যথার্থভাবে মূল্যায়ন না করা, সিনিয়র স্কেল পরীক্ষায় পাশ বিবেচনা না করা, বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (এসিআর) সন্তোষজনক কিনা তা বিবেচনা না করা।

৩.১.৪ প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত অনিয়ম: কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচন করা হয় না। একই ব্যক্তির একাধিক প্রশিক্ষণ বা একই বিষয়ের প্রশিক্ষণে একই ব্যক্তি একাধিকবার সুযোগ পায়। এতে সকলে যেমন প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়, তেমনি একাধিক প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী ব্যক্তি আর্থিকভাবে লাভবান হয়।

সারনি ৩.১: জনবল ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন খাতে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ের অভিযোগ	
নিয়োগ	**টাকা**
অ্যাডহক চিকিৎসক	৩-৫ লক্ষ
তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী	১-৫ লক্ষ
বদলি	
প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের ঢাকা এবং ঢাকার পাশ্ববর্তী জেলায়	৫-১০ লক্ষ
চিকিৎসকদের উপজেলা এবং সদর থেকে ঢাকায়	১-২ লক্ষ
দুর্গম এলাকা থেকে সদরে, এক উপজেলা থেকে অন্য উপজেলা, এবং উপজেলা থেকে সদরে	১০-৫০ হাজার
চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের	৫০ হাজার-২ লক্ষ
সুবিধাজনক স্থানে দীর্ঘদিন অবস্থানের জন্য	২.৫ লক্ষ বা তার ওপরে
পদোন্নতি	
ডিপিসি'র মাধ্যমে পদে	৫-১০ লক্ষ

৩.১.৫ ক্রয়ে অনিয়ম ও দুর্নীতি

পথ্য ক্রয়ে: পথ্যের সরবরাহকারী বাছাইয়ে দলীয় রাজনৈতিক প্রভাব বিদ্যমান রয়েছে। এতে আগ্রহী সকল ঠিকাদারের দরপত্রে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে না। ঠিকাদার দরপত্র কমিটির সদস্যদের সাথে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমঝোতা আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে কাজ আদায় করে থাকে। সর্বনিম্ন মূল্য প্রদানকারী ঠিকাদারকে দরপত্র দেওয়া হলেও দরপত্রে ঠিকাদার কিছু কিছু সামগ্রীতে যেমন বাজারমূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্য প্রদান করে এবং অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়, তেমনি অন্যান্য দ্রব্যাদির মূল্যও বাজার মূল্য অপেক্ষা কম মূল্য প্রদান করা হয়। এতে দরপত্রে উল্লিখিত দ্রব্যের সকল ঠিকাদার যেমন সরবরাহ করে না, তেমনি সমপরিমাণের দ্রব্যও সরবরাহ করা হয় না।

ওষুধ ও চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ক্রয়ে

- কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইডিসিএল বরাবর নির্দিষ্ট ওষুধের চাহিদা পাঠানো হলেও তা সরবরাহ করা হয় না। ছয় মাস/এরও কম মেয়াদ আছে -এ ধরনের ওষুধ আকস্মিক স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠাগুলোতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরবরাহ করা হয়। স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে যন্ত্রপাতি সরবরাহে অধিদপ্তরের মাধ্যমে সিএমএসডি কর্তৃক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়। কিছু ক্ষেত্রে চাহিদা না পাঠালেও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তে যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়। এতে স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে যন্ত্রপাতি পরিচালনায় প্রয়োজনীয় এবং দক্ষ জনবল এবং অবকাঠামোগত সুবিধার অভাবে এ সকল যন্ত্রের সকল ব্যবহৃত হয় না। যদিও সাম্প্রতিক সময়ে চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ও ওষুধ চাহিদার ভিত্তিতে ক্রয়ের বিভিন্ন শর্তাবলী উল্লেখ করে মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিপত্র জারি (২৪ জুন, ২০১৪) করা হয়।
- চিকিৎসা যন্ত্রপাতি মেরামতে রয়েছে নিমিউ। নিমিউতে দক্ষ জনবলের যেমন ঘাটতি রয়েছে, তেমনি অনেক ক্ষেত্রে সিএমএসডি'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে যোগসাজশে নিমিউ-র কর্মকর্তা কমিশনের বিনিময়ে অনাপত্তিপত্র প্রদান করে এবং বাইরের প্রতিষ্ঠানকে কাজ দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এছাড়া হাসপাতালের ভবন মেরামত ও সংস্কার কাজে রয়েছে স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর। সংস্কার কাজ যথার্থভাবে না করে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগসাজশ করে ঠিকাদার কর্তৃক বিল তুলে নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

৩.১.৬ সরকারি স্বাস্থ্যসেবায় অনিয়ম ও দুর্নীতি

- হাসপাতাল হতে চিকিৎসাসেবা গ্রহণে রোগীদের কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হতে হয়। এ প্রসঙ্গে ২০১১-২০১৩ পর্যন্ত সময়ে টিআইবি পরিচালিত বিভিন্ন জরিপ অনুযায়ী দেখা যায়, উপজেলা পর্যায়ে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবস্থান করার নিয়ম থাকলেও চিকিৎসকদের অনেকে কর্মস্থলে যেমন নিয়মিত উপস্থিত থাকে না, তেমনি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতালে কোনো কোনো চিকিৎসক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত থাকে না। রোগীদের কিছু ভর্তির সাথে সাথে শয্যা পায় না, একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাদেরকে মেঝেতে থাকতে হয় এবং রোগীকে চিকিৎসকের ব্যক্তিগত চেম্বার/বেসরকারি ক্লিনিকে যাওয়ার পরামর্শ প্রদান করা হয়। হাসপাতাল হতে পথ্য গ্রহণকারীদের কেউ কেউ পথ্যের মান সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করে। এছাড়া হাসপাতাল হতে নির্দিষ্ট সেবা পেতে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থও দিতে হয়। যেমন, টিকিট ক্রয়ে, শয্যা/ কেবিন পেতে, ট্রলি ব্যবহারে, পরীক্ষা-নিরীক্ষায়, ইনজেকশন ও স্যালাইন পুশে, অ্যাম্বুলেন্স সেবায়, আয়া ও ওয়ার্ডবয়দের সেবায়, এবং ড্রেসিং সেবা প্রভৃতিতে। প্যাথলজি, রেডিওলজি বা অন্যান্য পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলো করতে

রোগীকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরামর্শ প্রদানকারী ব্যক্তির পছন্দের নির্দিষ্ট ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পাঠানোর পরামর্শ দেওয়া হয়।

৩.১.৭ বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবায় অনিয়ম ও দুর্নীতি

- অর্ডিন্যান্স ১৯৮২ অনুযায়ী বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে রোগীর অপারেশন, চিকিৎসা ও তত্ত্বাবধানের জন্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এবং প্রতি ১০ শয্যার জন্য একজন সার্বক্ষণিক নিবন্ধিত চিকিৎসক, দুজন নার্স ও একজন সুইপারের কথা বলা হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা মানা হয় না, অনেকক্ষেত্রে প্রশিক্ষিত ও যোগ্যতাসম্পন্ন টেকনিশিয়ান রাখা হয় না। ডাক্তার কর্তৃক পরামর্শ ফি'র রশিদ রোগীকে প্রদান করার কথা বলা হলেও তা মানা হয় না এবং পরামর্শ গ্রহণকারী ব্যক্তির নাম এবং ঠিকানা নিবন্ধন সম্পর্কে বলা হলেও নাম লিপিবদ্ধ করা হলেও ঠিকানা করা হয় না।
- চিকিৎসকদের সাথে ডায়াগনস্টিক সেন্টারের কমিশনভিত্তিক চুক্তি হয়ে থাকে। এ কমিশনের হার নির্ভর করে কোন ডাক্তার কত সংখ্যক রোগী পাঠায় তার ওপর। এ প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকরা জানান, এ কমিশনের হার ৩০%-৫০% পর্যন্ত হয়। একইভাবে দালালদের কমিশন ১০%-৩০% পর্যন্ত হয়ে থাকে।
- অনেকক্ষেত্রে প্যাথলজিস্ট না রেখে তাদের সিল ব্যবহার করে বিভিন্ন পরীক্ষার প্রতিবেদন তৈরি করে রোগীদের রিপোর্ট প্রদান করা হয়
- নিবন্ধিত কোনো মেডিকেল/ডেন্টাল চিকিৎসক বিএমডিসি কর্তৃক স্বীকৃত নয় এমন কোনো নাম, পদবি, বিবরণ ব্যবহার বা প্রকাশ করে মেডিকেল প্র্যাকটিস করতে পারবে না বলা হলেও এটি মানা হয় না। চিকিৎসকদের অতিরিক্ত যোগ্যতা এবং ভুয়া পদবি ব্যবহার করে মেডিকেল প্র্যাকটিসের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল আইনের যথাযথ প্রয়োগে দুর্বলতা রয়েছে।

৩.২ স্বাস্থ্যখাতে সুশাসনের ঘাটতির কারণ ও প্রভাব বিশ্লেষণ

স্বাস্থ্যখাতে সুশাসনের ঘাটতির কারণ বিশ্লেষণে বলা যায়, আইনের সীমাবদ্ধতা/উপস্থিতি/প্রয়োগের ঘাটতি, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সংবেদনশীলতা, ও তদারকির ঘাটতি। এছাড়াও রয়েছে দলীয় রাজনীতিকরণ, দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার ঘাটতি, অবকাঠামোগত দুর্বলতা, এবং আর্থিক বরাদ্দের স্বল্পতা। স্বাস্থ্যখাতে সুশাসন নিশ্চিতকরণে অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রভাব ফেলে। যেমন, নিয়োগ, বদলি, পদায়ন, ও পদোন্নতি কার্যক্রমের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে দলীয়করণের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। দেশে ডাক্তারের ভুল চিকিৎসায় এবং ভুয়া চিকিৎসকদের প্রভাবে রোগীরা মৃত্যু ঝুঁকিতে পড়ছে। ফলশ্রুতিতে চিকিৎসাসেবার প্রতি জনগণের অনাস্থা তৈরি হচ্ছে এবং বিদেশে চিকিৎসাসেবা গ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান হতে চিকিৎসাসেবা নিতে গিয়ে কিছু কিছু ক্ষেত্রে রোগীদের নিয়ম-বহির্ভূত অর্থও দিতে হয়। এতে রোগীরা আর্থিক ক্ষতির শিকার হন।

একনজরে সুশাসনের ঘাটতি: কারণ-ফলাফল-প্রভাব

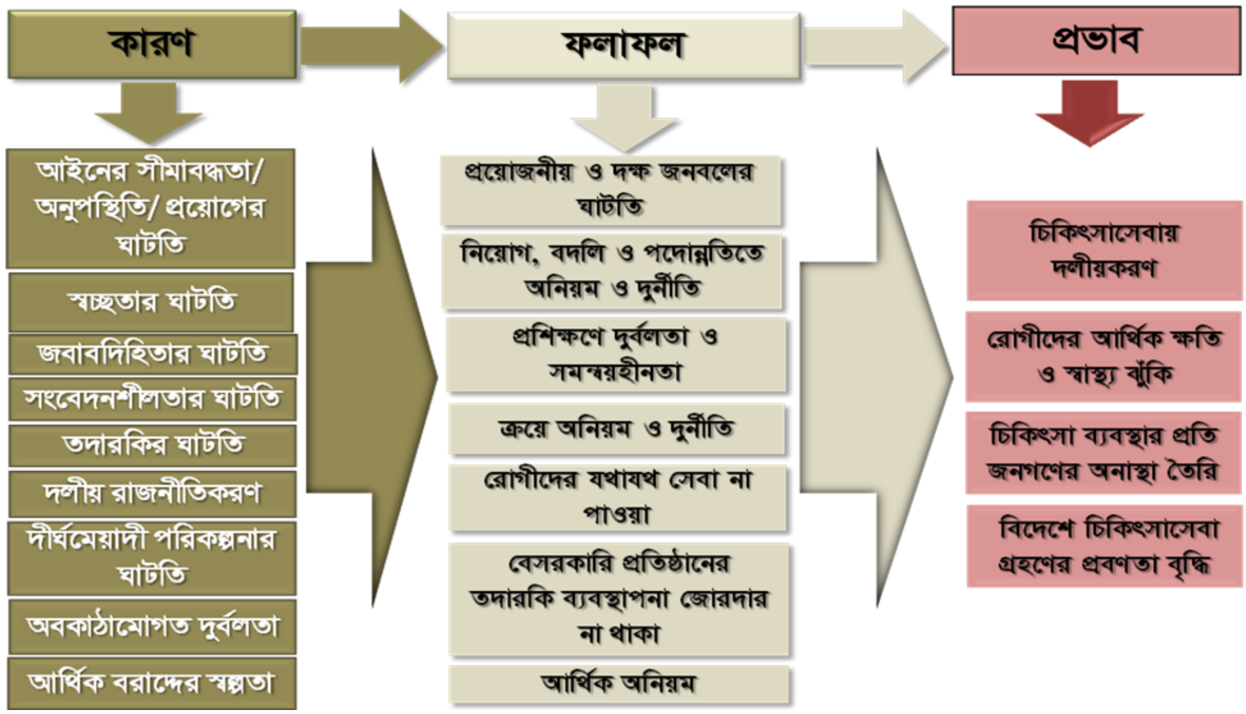

৩.৩ সুপারিশ

গবেষণার ফলাফলের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সমস্যা থেকে উত্তরণে নিচের সুপারিশ প্রস্তাব করা হল। এই সুপারিশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে চিকিৎসাসেবার মান বৃদ্ধি পাবে; সর্বোপরি সুশাসন নিশ্চিত হবে বলে আশা করা যায়।

আইন ও নীতি-নির্ধারণী সম্পর্কিত

১. **প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন আইন প্রণয়ন ও বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে হবে-**

- বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের আইন লঙ্ঘনের প্রেক্ষিতে শাস্তির পরিমাণ বৃদ্ধি;
- প্রদত্ত সেবা ও প্রতিষ্ঠানের মান অনুযায়ী পরামর্শ ফি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মূল্য নির্ধারণ;

২. বেসরকারি চিকিৎসা সেবা বিষয়ক খসড়া আইন স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে চূড়ান্ত করতে হবে ও আইন হিসেবে প্রণয়ন করতে হবে।

আর্থিক বরাদ্দ সংক্রান্ত

৩. জাতীয় বাজেটে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে

৪. মোট বরাদ্দের মধ্যে অনুন্নয়ন বাজেটের পাশাপাশি উন্নয়ন বাজেটের অনুপাতও বৃদ্ধি করতে হবে (উন্নয়ন বরাদ্দ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমস্যা বিদ্যমান থাকলে সেগুলো চিহ্নিত করে সমাধানের জন্যে বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে)

মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত

৫. সিভিল সার্জন, ডেপুটি সিভিল সার্জন, তত্ত্বাবধায়ক, ইউএইচএফপিও, মেডিকেল টেকনোলজিস্ট, অ্যানেসথেটিস্ট, সিনিয়র কনসালটেন্ট প্রভৃতি শূন্য পদ পূরণে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৬. জনবল নিয়োগে দীর্ঘসূত্রতা দূর করতে হবে; প্রয়োজন অনুযায়ী চাহিদা যাচাই সাপেক্ষে জনবল নিয়োগে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন ও অর্থ মন্ত্রণালয় সমন্বিতভাবে একটি দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৭. স্বাস্থ্যখাতের নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতিসহ সকল ধরনের কর্মকাণ্ডে পেশাজীবী সংগঠনগুলোর দলীয় হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে।

৮. মেধা, জ্যেষ্ঠতা ও কর্মদক্ষতার (পারফরমেন্স) ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য যোগ্য প্রার্থীর নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করতে হবে।

৯. সরকারি ওষুধ চুরি বন্ধে, কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাস্থ্য সহকারীদের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণে তদারকি কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।

সেবা সম্পর্কিত

১০. রোগীর তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিটি হাসপাতালে তথ্য ও অনুসন্ধান ডেস্ক কার্যক্রম চালু করতে হবে; নাগরিক সনদ, বিভাগ/ওয়ার্ড ও সেবা প্রদানের অবস্থান নির্দেশকসহ তথ্য বোর্ড টানাতে হবে।

১১. চিকিৎসকের অবহেলা বা ভুল চিকিৎসার ক্ষেত্রে কার্যকর আইন প্রণয়ন ও তার প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

১২. বিএমডিসি'র ওয়েবসাইটে নিবন্ধিত চিকিৎসকদের ডিগ্রি/ যোগ্যতাসহ তালিকা প্রকাশ করতে হবে এবং নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে। এসএমএস-এর মাধ্যমে নিবন্ধিত ডাক্তারের অনুসন্ধানের ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

১৩. কর্মস্থলে চিকিৎসকদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য-

- বসবাসের উপযোগী আবাসন সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে;
- প্রত্যন্ত এলাকার জন্য এবং ছুটিকালীন দায়িত্ব পালনের জন্য বিশেষ প্রণোদনা ভাতা দিতে হবে;

১৪. স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা নিয়মিতকরণ করতে হবে এবং সভা নিয়মিতকরণে স্থানীয় সংসদ সদস্যদের সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

ক্রয়, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কিত

১৫. ঠিকাদার নির্বাচনে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে সকল ক্ষেত্রে ই-টেন্ডারিং প্রক্রিয়া চালু করতে হবে।

১৬. বিভিন্ন পর্যায়ের হাসপাতালে সেবার ধরন ও সেবা প্রদানে জনবল, যন্ত্রপাতি, আনুষঙ্গিক স্থাপনা বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় নির্ধারণে একটি এসওপি (স্ট্যান্ডার্ড অপারেশন প্রসিডিউর) তৈরি করতে হবে।

১৭. সরকারি হাসপাতালে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সেবাগ্রহীতা থেকে প্রাপ্ত আয়ের একটি অংশ (৫০%) জরুরি প্রয়োজনে (অ্যাম্বুলেন্স ও চিকিৎসা যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ) খরচের ক্ষমতা দিতে হবে।

অধ্যায় এক

ভূমিকা

১.১ প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ সংবিধান অনুযায়ী চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপাদানের ব্যবস্থা করা এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করা রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব।[২] বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সনদ ও ঘোষণার[৩] লক্ষ্য অর্জনে স্বাক্ষরদাতা দেশ হিসেবে স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন[৪] এবং জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে ২০১৫ সালের মধ্যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অনুসারে জনস্বাস্থ্যের কয়েকটি ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য[৫] অর্জনেও বাংলাদেশ অঙ্গীকারবদ্ধ। এসব লক্ষ্য অর্জনে রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে রাজনৈতিক অঙ্গীকার প্রতিফলিত হয়, যেমন বর্তমান সরকার দলীয় প্রধান রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির মধ্যে ছিল মাঠ পর্যায়ে ডাক্তারদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসার ব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে জেলা থেকে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত করা, সেবার মান উন্নত ও ওষুধের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তদারকি ব্যবস্থা উন্নত করা, চিকিৎসা ও চিকিৎসা শিক্ষা নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা ও কর্মক্ষমতা বাড়ানো, এবং মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজের মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষাবিদদের সম্পৃক্ত করা প্রভৃতি।[৬]

স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে রাজনৈতিক অঙ্গীকার পূরণে বিভিন্ন সময়ে সরকারগুলো ধারাবাহিকভাবে কাজ করে এসেছে। সকলের জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে প্রণীত হয়েছে 'জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১১'। স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা খাতের উন্নয়নে স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচি- এইচপিএসপি (১৯৯৮-২০০৩) ও স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচি- এইচএনপিএসপি (২০০৩-২০১১) নামে বৃহৎ দুটি কর্মসূচি দেশব্যাপী বাস্তবায়ন করা হয়। এ ধারা অব্যাহত রাখতে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচির (এইচপিএনএসডিপি) আলোকে তৃতীয় সেক্টর কর্মসূচি (২০১১-২০১৬) প্রণয়ন করা হয় যার অধীনে বর্তমানে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে ১৭টি, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরে সাতটি এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়ে আটটিসহ মোট ৩২টি অপারেশন প্ল্যান (ওপি) বাস্তবায়নাধীন।[৭]
জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে সরকারি স্বাস্থ্য কাঠামোয় ছয়টি স্তর রয়েছে - জাতীয় পর্যায়, বিভাগীয় পর্যায়, জেলা পর্যায়, উপজেলা পর্যায়, ইউনিয়ন পর্যায় এবং ওয়ার্ড পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা।[৮] বেসরকারি পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে রয়েছে বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিক এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টার।[৯] এছাড়া স্বাস্থ্যখাতকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক[১০] কার্যক্রমের মধ্যে কমিউনিটি ক্লিনিক কার্যক্রম, অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন, স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণ, চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন, স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়ন, ইলেকট্রনিক স্বাস্থ্য সেবার মাধ্যমে স্বাস্থ্য প্রশাসন উন্নয়ন ও গতিশীলকরণ, এবং নতুন আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন অন্যতম।

স্বাস্থ্যখাতে গৃহীত এসব উদ্যোগের ফলে নবজাতক শিশুমৃত্যু ও মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস পেয়েছে, গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে, উর্বরতা হার হ্রাস পেয়েছে। যেমন, স্থূল জন্মহার (প্রতি হাজারে) এবং স্থূল মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে) ২০০৩ সালে যেখানে ছিল ২০.৩ ও ৫.৯, ২০১১ সালে তা কমে দাঁড়ায় ১৯.২ ও ৫.৬। শিশু মৃত্যুর হার (নবজাতক, এক বছরের নিচে, প্রতি হাজারে) ২০০৪ সালে যা ছিল ৮৮, ২০১২ সালে তা কমে দাঁড়ায় ৪১। মাতৃ মৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে) ২০০৩ সালে ছিল ৩৮, ২০১১ সালে ১৯.৪। গড় আয়ু (বছরে) ২০০৩ সালে ছিল ৬৪.৯, ২০১২ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৭০.৩-তে। উর্বরতার হার (নারী প্রতি) ২০০৩ সালে ছিল ২.৬, ২০১২ সালে ২.২, এবং গর্ভনিরোধক ব্যবহারের হার ২০০৩ সালে ছিল ৫৫.১, ২০১১ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬১.২।[১১] স্বাস্থ্য

---

[২] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ১৫ ও ১৮।

[৩] এর মধ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রাথমিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত আলমা-আতা ঘোষণা, জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা [অনুচ্ছেদ ২৫(১)], আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সনদ [অনুচ্ছেদ ১২], শিশু অধিকার সনদ [অনুচ্ছেদ ২৪], নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত কনভেনশন [অনুচ্ছেদ ১২], এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০১৫ উল্লেখযোগ্য।

[৪] *জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি* ২০১১, সুস্বাস্থ্য উন্নয়নের হাতিয়ার, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

[৫] এর মধ্যে ক্ষুধা ও দারিদ্র বিমোচন নিরসন (লক্ষ্য ১), শিশু মৃত্যুর হার এক তৃতীয়াংশে কমিয়ে আনা (লক্ষ্য ৪), মাতৃসেবার উন্নয়ন (লক্ষ্য ৫) প্রত্যক্ষভাবে স্বাস্থ্যের সাথে সম্পৃক্ত।

[৬] বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, *নির্বাচনী ইশতেহার ২০০৮ ও ২০১৪*।

[৭] বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২-২০১, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

[৮] বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সাধারণ তথ্য পরিশিষ্ট ১-এ দেওয়া হল।

[৯] বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে বর্ণনা এ গবেষণা প্রতিবেদনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

[১০] স্বাস্থ্য খাতে সরকারের গৃহীত উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত পরিশিষ্ট ২-এ দেওয়া হল।

[১১] বিস্তারিত জানতে দেখুন, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪*, http://www.unicef.org/infobycountry/bangladesh bangladesh_statistics.html,

সূচকে অগ্রগতির প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও পুরস্কার লাভ করে। যেমন, শিশু মৃত্যুর হার প্রত্যাশিত পর্যায়ে কমিয়ে আনতে সক্ষম হওয়ায় (এমডিজি-৪) জাতিসংঘ বাংলাদেশকে পুরস্কৃত করে, এবং টিকাদানের মাধ্যমে শিশু মৃত্যুহার কমানোর কর্মসূচিতে অসামান্য সাফল্যের জন্য *গ্লোবাল এলায়েন্স ফর ভ্যাকসিনস অ্যান্ড ইম্যুনাইজেশন (গাভী)* পুরস্কার লাভ করে।

স্বাস্থ্যসূচকের অগ্রগতির পেছনে বিদ্যমান মূল প্রভাবকসমূহ বিশ্লেষণে দেখা যায়, শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়নে রয়েছে সরকার কর্তৃক বাস্তবায়িত বিনামূল্যে শিশু টিকা ও পোলিও কর্মসূচি এবং নানামুখী সেবা কার্যক্রম, মাতৃদুগ্ধ প্রদান নিশ্চিত করার জন্য দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত মায়েদের আর্থিক সাহায্য প্রদান ও আয়রন ট্যাবলেট প্রদান কার্যক্রম। গড় আয়ু বৃদ্ধির কারণ হিসেবে সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ, পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, নারী শিক্ষার উন্নয়ন, জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণ উল্লেখ করা যায়।[১২] তবে স্বাস্থ্যসূচকে মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস পেলেও তা এখনো প্রত্যাশিত পর্যায়ে পৌঁছে নি।[১৩]

১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা

স্বাস্থ্যখাতে বিভিন্ন উদ্যোগ, অগ্রগতি ও অর্জন থাকা সত্ত্বেও এ খাতে সুশাসনের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান যা স্বাস্থ্য সম্পর্কিত জরিপ প্রতিবেদন, স্বাস্থ্য বিষয়ক জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অভিজ্ঞতাভিত্তিক জাতীয় পরামর্শ সভায় অংশগ্রহণকারী বিশেষজ্ঞদের মতামত, এবং বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে[১৪] ফুটে ওঠে। এসব প্রতিবেদনে জনবল (নিয়োগ-বদলি-পদোন্নতি), ডাক্তারের উপস্থিতি, বিভিন্ন সেবা, পথ্যের মান, ওষুধ ও চিকিৎসা উপকরণ, ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধি ও দালালের উপস্থিতি, এবং বেসরকারি চিকিৎসার মান সংক্রান্ত সুশাসনের সমস্যা উল্লেখ করা হয়েছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) পরিচালিত ২০১২ সালের জাতীয় খানা জরিপে দেখা যায় সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান হতে চিকিৎসাসেবা গ্রহণকারী খানাগুলোর ৪০.২% কোনো না কোনো অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে, এবং এসব খানার ২১.৫% এসব সেবা পেতে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে (রশিদ ছাড়া) গড়ে ২৫৮ টাকা দিয়েছে বা দিতে বাধ্য হয়েছে।[১৫] এ জরিপে দেখা যায় জাতীয়ভাবে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণকারী খানাগুলো বিভিন্ন সেবা পেতে মোট ৭০.৩ কোটি টাকা নিয়ম-বহির্ভূতভাবে দেয় বা দিতে বাধ্য হয়।[১৬]

টিআইবি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করছে। এজন্য টিআইবি ও এর অনুপ্রেরণায় গঠিত সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) স্থানীয় (৪৫টি এলাকায়) ও জাতীয় পর্যায়ে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে যে তিনটি খাত নিয়ে কাজ করছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে স্বাস্থ্যখাত। এ খাতের অধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের[১৭] ওপর বিভিন্ন গবেষণা ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করেছে টিআইবি, যার মধ্যে রয়েছে বেইজলাইন জরিপ[১৮] ও রিপোর্ট কার্ড জরিপ,[১৯] জাতীয় খানা জরিপের[২০] অধীনে স্বাস্থ্যসেবার ওপর জরিপ, স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ সভা,[২১] এবং জাতীয় পর্যায়ের হাসপাতালের ওপর বিস্তারিত গবেষণা কার্যক্রম।[২২] এসব গবেষণা প্রতিবেদন হতে স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে চিকিৎসাসেবায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জের ধরন সম্পর্কে জানা যায়। এছাড়া জাতীয় খানা জরিপে এ খাতে খানা পর্যায়ে সেবা বিষয়ক দুর্নীতির সার্বিক চিত্র সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এছাড়া

---

[১২] বিস্তারিত জানতে দেখুন, www.mohfw.gov.bd (accessed on 10 June 2014)

[১৩] বিস্তারিত জানতে দেখুন, www.thefinancialexpress-bd.com (accessed on 10 January 2013).

[১৪] উদাহরণ হিসেবে দেখুন 'চার সহস্রাধিক চিকিৎসকের চূড়ান্ত নিয়োগ এপ্রিলেই', *দৈনিক যুগান্তর*, ৩০ এপ্রিল ২০১০; 'ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ ইন্টার্নদের ধর্মঘট', *বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম*, ১০ নভেম্বর ২০১৩; 'সারাদেশে হাসপাতালগুলোতে ব্যাহত চিকিৎসা সেবা, মন্ত্রণালয়ের উদ্বেগ', *দৈনিক ইনকিলাব*, ২৯ জানুয়ারি ২০১৪; 'তিনটি অ্যাম্বুলেন্সের দুটি অচল, দুর্ভোগ', *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৪; 'ভুয়া ডাক্তারদের ধরতে অভিযান চালাবে সরকার', *দৈনিক আমাদের সময়*, ১৯ মার্চ ২০১৪; 'কর্মস্থলে চিকিৎসকদের অনুপস্থিতি', *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৪; 'সোহরাওয়ার্দীতে বসেই ৭ হাসপাতাল নিয়ন্ত্রণ করেন স্বাচিপের এক নেতা (নিয়োগ, বদলি ও কেনাকাটা চলে তার ইশারায়)', *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৪; 'সরকারি হাসপাতালে ৫৮৫টি যন্ত্র বাক্সবন্দী', *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৬ জুলাই ২০১৩।

[১৫] টিআইবি, *সেবাখাতে দুর্নীতি, জাতীয় খানা জরিপ* ২০১২।

[১৬] *প্রাগুক্ত*।

[১৭] স্থানীয় পর্যায়ে সনাক সাতটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ৩৪টি জেলা সদর হাসপাতাল/ জেনারেল হাসপাতাল ও চারটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল নিয়ে বর্তমানে কাজ করছে।

[১৮] একটি নির্দিষ্ট প্রকল্পের কার্যক্রম শুরুর সময়ে প্রকল্প বা খাতের অবস্থা নির্ণয় করে পরবর্তীতে একটি নির্দিষ্ট সময় পর প্রকল্পের প্রভাব যাচাই করার জন্যই বেইজলাইন জরিপ পরিচালনা করা হয়।

[১৯] রিপোর্ট কার্ড হচ্ছে কোনো সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সেবা গ্রহণকারীদের কতটুকু সন্তুষ্ট করতে পারছে তা যাচাই করার একটি কৌশল।

[২০] বাংলাদেশের খানাগুলো বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সেবা খাত হতে সেবা নিতে গিয়ে যে ধরনের দুর্নীতির সম্মুখীন হয় তার প্রকৃতি ও মাত্রা নিরূপণের উদ্দেশ্যে জাতীয় খানা জরিপ পরিচালিত হয়।

[২১] ২০১৩ সালের ৩ জুলাই ঢাকায় স্থানীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ এবং তা থেকে উত্তরণের উপায় হিসেবে জাতীয় পর্যায় থেকে কী ধরনের নীতিনির্ধারণী সহায়তা প্রয়োজন তা চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে টিআইবি 'স্বাস্থ্যসেবায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়: জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অভিজ্ঞতাভিত্তিক জাতীয় কর্মশালায়' শীর্ষক একটি পরামর্শ সভার আয়োজন করে, যেখানে স্থানীয় পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, স্থানীয় নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ও স্বাস্থ্যখাতের জাতীয় পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মতবিনিময়ের সুযোগ ঘটে।

[২২] ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওপর ২০০৬ ও ২০১৩ সালে দুইটি গবেষণা প্রকাশিত হয়।

স্বাস্থ্যখাতে বিদ্যমান সুশাসনের বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জের ওপর গবেষণা রয়েছে যেখানে ওষুধ ব্যবস্থাপনা, মানবসম্পদ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা (হুসমান, ২০১১), চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ক্রয় ও সরবরাহ, অবকাঠামো, সেবার মান (বার্ড, ২০১৩), এবং যন্ত্রপাতি, ওষুধ ক্রয় ও সরবরাহ, মেডিকেল গবেষণা, চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস, এবং দুর্নীতি (নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ প্রদান) (এমএসআই, ২০০২) প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

স্বাস্থ্যখাতের সুশাসন নিয়ে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা হলেও চিকিৎসাসেবায় সার্বিকভাবে সুশাসনের সমস্যা বিশেষত অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন, মাত্রা, কারণ, প্রভাব ও সেবার মান নিয়ে গবেষণার ঘাটতি ও টিআইবি'র কার্যক্রমে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত তিনটি খাতের একটি স্বাস্থ্য এবং এ খাতের ওপর ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বর্তমান গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য

এ গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য স্বাস্থ্যখাতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা এবং তা থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ প্রস্তাব করা।

গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে -

১. চিকিৎসা সেবা ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আইনি, কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা; এবং
২. চিকিৎসা সেবায় বিরাজমান অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন ও মাত্রা চিহ্নিত করা, এবং তার কারণ ও প্রভাব বিশ্লেষণ করা।

১.৪ গবেষণার আওতা

এ গবেষণায় স্বাস্থ্যখাত বলতে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং এর আওতাধীন বিভিন্ন পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান (কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, জেলা সদর হাসপাতাল/ জেনারেল হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান) বোঝানো হয়েছে। এছাড়া স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সংস্থা, ন্যাশনাল ইলেকট্রো-মেডিকেল ইক্যুইপমেন্ট মেইন্টেন্যান্স ওয়ার্কশপ অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টারকে এ গবেষণার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিলকেও (বিএমডিসি) গবেষণার আওতায় আনা হয়েছে। এ গবেষণার সুনির্দিষ্ট আওতা হল:

- স্বাস্থ্য অধিদপ্তরাধীন চিকিৎসা সেবাদানকারী ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা (অবকাঠামো, বাজেট, জনবল) - স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি হাসপাতাল
- সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের জনবল ব্যবস্থাপনা (নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ)
- সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের ক্রয়, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা
- সরকারি ও বেসরকারি চিকিৎসা সেবা প্রতিষ্ঠানের সেবা কার্যক্রম
- বেসরকারি চিকিৎসা সেবা প্রতিষ্ঠানের তদারকি ব্যবস্থাপনা

১.৫ গবেষণা পদ্ধতি

এটি একটি গুণগত তথ্যভিত্তিক গবেষণা। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিমাণগত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে।

১.৫.১ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

প্রাথমিক ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎস হতে গুণগত তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গুণগত তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতির মধ্যে ছিল মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার ও দলীয় আলোচনা। পরোক্ষ উৎসের মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি, পরিপত্র, অর্ডিন্যান্স, স্মারক, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত টিআইবি'র গবেষণা প্রতিবেদন,[২৩] স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত প্রতিবেদন, ওয়েবসাইট, নিরীক্ষা প্রতিবেদন, গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন। এছাড়াও ছিল টিআইবি'র স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ সভা (অংশগ্রহণকারী জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, স্থানীয় নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ও জাতীয় পর্যায়ের নীতি-নির্ধারক), এবং গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন। বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্যের সত্যতা যাচাই করা হয়েছে।

মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার: প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য চেকলিস্ট ব্যবহার করে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের অধীন বিভিন্ন পর্যায়ের ৩৫ জন মুখ্য তথ্যদাতার কাছ থেকে চেকলিস্টের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা

[২৩] এসব গবেষণার মধ্যে রয়েছে জাতীয় খানা জরিপ ২০১২ (৬৪টি জেলায় সরকারি স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণকারী মোট খানা ৩,২০৮টি), ২৮টি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের ওপর ২৮টি রিপোর্ট কার্ড জরিপ (উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স তিনটি, জেলা সদর হাসপাতাল ২৩টি, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল দুইটি); মোট উত্তরদাতা ১৪,২৭৬ জন, জাতীয় পর্যায়ে ডায়াগনস্টিক গবেষণা।

হয়েছে। প্রাথমিক তথ্যের জন্য ডাক্তার (অধ্যাপক, অধ্যক্ষ, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক, সিনিয়র কনসালটেন্ট, জুনিয়র কনসালটেন্ট, রেজিস্ট্রার, সহকারী রেজিস্ট্রার, মেডিকেল অফিসার, সহকারী সার্জন), কর্মকর্তা (সাবেক স্বাস্থ্য উপ-সচিব, বিভাগীয় পরিচালক, সিভিল সার্জন, উপ-পরিচালক, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কর্মকর্তা, প্রশিক্ষণ স্পেশালিস্ট, সহকারী পরিচালক, কর্মসূচি কর্মকর্তা, প্রশাসনিক কর্মকর্তা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তরাধীন কর্মচারী (উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার, অফিস সহকারী), ডায়াগনস্টিক ল্যাবের মেডিকেল টেকনোলজিস্ট, শিক্ষার্থী, খাত-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংগঠন ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়।

দলীয় আলোচনা: বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের সাথে একটি দলীয় আলোচনা করা হয়, যেখানে **১৫** জন চিকিৎসক উপস্থিত ছিলেন। তাদের সাথে আলোচনায় স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে সরবরাহকৃত চিকিৎসা যন্ত্রপাতি, চিকিৎসকদের উচ্চতর শিক্ষা, কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ, সরকারি ও বেসরকারি চিকিৎসা সেবা ব্যবস্থাপনা ও সেবার মান প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

১.৬ তথ্যের সত্যতা যাচাই, সম্পাদনা ও বিশ্লেষণ

মুখ্য তথ্যদাতাদের সাথে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে পরোক্ষ উৎস হতে সংগৃহীত তথ্যের সত্যতা যাচাই করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গবেষণার খসড়া প্রতিবেদন ২০১৪ সালের ২৮ আগস্ট স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং সচিব মর্যাদার অন্যান্য কর্মকর্তাদের সামনে উপস্থাপন করা হয় এবং তাদের মূল্যবান মতামত গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে তাদের মতামতের ভিত্তিতে খসড়া গবেষণা প্রতিবেদনটি হালনাগাদ করা হয়।

১.৭ গবেষণার সময়

নভেম্বর ২০১৩ হতে আগস্ট ২০১৪ পর্যন্ত সময়ে গবেষণায় প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং পরোক্ষ তথ্য পর্যালোচনা করা হয়।

১.৮ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

গবেষণায় উপস্থাপিত পর্যবেক্ষণ স্বাস্থ্য খাতের সকল প্রতিষ্ঠা, কর্মরত সব ডাক্তার, নার্স, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সকল রোগীর ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। তবে এটি এ খাতে বিদ্যমান সুশাসনের সমস্যার ধরন সম্পর্কে একটি ধারণা প্রদান করবে।

১.৯ প্রতিবেদনের কাঠামো

প্রতিবেদনটি মোট সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার প্রেক্ষাপট, যৌক্তিকতা এবং গবেষণা পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্বাস্থ্যখাতের কাঠামো, বিভিন্ন অধিদপ্তরের কার্যক্রম পর্যালোচনা, স্বাস্থ্য বিষয়ক আইন, নীতিমালা, বিধি প্রভৃতি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে জনবল ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে, যেখানে নিয়োগ, বদলি, পদায়ন, পদোন্নতি ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে বিভিন্ন পণ্য (পথ্য, ওষুধ ও চিকিৎসা যন্ত্রপাতি) ক্রয়, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং পঞ্চম অধ্যায়ে সরকারি স্বাস্থ্যসেবার মান সম্পর্কে তুলে ধরা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে বেসরকারি চিকিৎসাসেবা ব্যবস্থাপনা ও তদারকি কার্যক্রম এবং সপ্তম অধ্যায়ে গবেষণার ফলাফলের আলোকে উপসংহার, সার্বিক পর্যবেক্ষণ, এবং সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে।

স্বাস্থ্য খাতের আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

২.১ ভূমিকা

জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশে রয়েছে প্রয়োজনীয় আইনি কাঠামো ও দেশব্যাপী বিস্তৃত স্বাস্থ্যসেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান। স্বাস্থ্য খাতের অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। আর সুশাসনের মূল সূচকসমূহের আলোচনার পূর্বে স্বাস্থ্য খাতে সরকার কর্তৃক প্রণীত বিভিন্ন নীতি, আইন ও বিধি, পরিপত্র, প্রজ্ঞাপন, নির্দেশনা এবং এর বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পর্কে একটি ধারণার প্রয়োজন। এ অধ্যায়ে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতের আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

২.২ স্বাস্থ্য খাত সম্পর্কিত নীতি ও আইনি কাঠামো

২.২.১ স্বাস্থ্য খাত সংশ্লিষ্ট নীতি

জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ২০১১: সকলের জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ও স্বাস্থ্য সেবার সাথে সংশ্লিষ্টদের মতামত পর্যালোচনা করে 'জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১১' চূড়ান্ত করে, যা ৩০ মে ২০১১ তারিখে মন্ত্রীসভার বৈঠকে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে নবম জাতীয় সংসদের ১২তম অধিবেশনের সংসদের বৈঠকে (৬ মার্চ ২০১২) এটি উপস্থাপনপূর্বক প্রকাশ করা হয়।
সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির মূল লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, সকল মানুষের কাছে চিকিৎসার মৌলিক উপকরণ পৌঁছে দেওয়া এবং পুষ্টির উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করা, জরুরি চিকিৎসাসেবাকে অগ্রাধিকার দেওয়া, শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস করা এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করা, সরকারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র ও হাসপাতালসমূহে চিকিৎসার প্রয়োজনীয় উপকরণ ও লোকবল নিশ্চিত করা এবং সেবার গুণগত মান বৃদ্ধি করা, স্বাস্থ্যসেবায় জনগণের নিজস্ব ব্যয় কমিয়ে আনা, তথ্য প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম ব্যবহার করা, স্বাস্থ্য তথ্য প্রাপ্তিতে জনগণের অধিকার নিশ্চিত করাসহ ই-গভর্নেন্স, ই-হেলথ, ই-জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম ও টেলিমিডিসিন সেবা গড়ে তোলা।[২৪]
জাতীয় ওষুধ নীতি ২০০৫: এই নীতির লক্ষ্যগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: মানসম্পন্ন অত্যাবশ্যকীয় ও অন্যান্য ওষুধ ক্রয়সাধ্য মূল্যে সাধারণ মানষের কাছে সরবরাহ করা, নকল, ভেজাল, নিম্নমানের ওষুধ প্রস্তুত, বিক্রয় ও বিতরণ নিষিদ্ধ করা এবং এরূপ কাজসমূহের জন্য দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া, দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে উন্নত মানের অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ প্রস্তুত করার জন্য সকল স্থানীয় ও বিদেশী কোম্পানিকে উৎসাহিত করা ইত্যাদি।
বেসরকারি মেডিকেল কলেজ স্থাপন ও পরিচালনা নীতিমালা ২০১১ (সংশোধিত): দেশের জনগোষ্ঠীকে সেবা দেওয়ার লক্ষ্যে সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতে চিকিৎসা পেশাজীবী তৈরিতে সরকার ২০১১ সালে 'বেসরকারি মেডিকেল কলেজ স্থাপন ও পরিচালনা নীতিমালা ২০১১ (সংশোধিত)' প্রণয়ন করে। এই নীতিমালায় বেসরকারি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের জন্য আবেদনের পদ্ধতি, অবকাঠামোগত বিষয়, শিক্ষা কার্যক্রম চালুকরণ প্রক্রিয়া, মেডিকেল কলেজ পরিদর্শন ও মূল্যায়ন প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত।[২৫]

দেশের অভ্যন্তরে স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষা/প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত প্রেষণ নীতিমালা ২০১৩: বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের চাহিদা পূরণ এবং সেবার মান উন্নীতকরণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি চাকরিরত চিকিৎসকদের এই নীতিমালার অধীনে দেশের অভ্যন্তরে স্নাতকোত্তর উচ্চশিক্ষা/ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রেষণকালীন উচ্চশিক্ষায় অংশগ্রহণকারী/ প্রশিক্ষণরতদের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) হিসেবে সংযুক্ত রাখা হয়।[২৬] এই নীতিমালা অনুসারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ ও ইনস্টিটিউটে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে সরকারি ও বেসরকারি উভয় ধরনের চিকিৎসকদের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ রয়েছে।

২.২.২ স্বাস্থ্যখাত সংশ্লিষ্ট আইনি কাঠামো

নিয়োগ সংক্রান্ত আইন ও বিধি: স্বাস্থ্যখাতে সরকারি প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর শূন্যপদে সরাসরি নিয়োগ 'বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৮১' দ্বারা পরিচালিত। অ্যাডহক ভিত্তিতে ডাক্তার নিয়োগের জন্য 'প্রথম শ্রেণির (নন-ক্যাডার মেডিকেল)

[২৪] স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, *জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি* ২০১১।
[২৫] নং-স্বাপকম/চিশিজ-২/আইন ও বিধি-৩/(অংশ-২)/২০০৮/১৬২, তারিখ: ২২/০৬/২০১১।
[২৬] স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, দেশের অভ্যন্তরে স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষা ও তদুদ্দেশে প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত সংশোধিত প্রেষণ নীতিমালা-২০১৩।

কর্মকর্তা নিয়োগ বিধিমালা, ২০১০' প্রণীত হয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীন তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ কার্যক্রম সিভিল সার্জন দপ্তর এবং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলো পরিচালনা করে।[২৭]

চিকিৎসকদের পেশাগত চর্চা ও নিবন্ধন সংক্রান্ত আইন: 'বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আইন, ২০১০'-এর মাধ্যমে চিকিৎসকদের নিবন্ধন এবং পেশাগত চর্চার সনদ দেওয়া হয়। এই আইনে কাউন্সিল কর্তৃক নিবন্ধিত না হয়েও চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত এরূপ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, চিকিৎসা শাস্ত্র বিষয়ক ভুয়া পদবি, ডিগ্রি, প্রতারণামূলক প্রতিনিধিত্ব অথবা নিবন্ধন ইত্যাদির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিধান অন্তর্ভুক্ত।[২৮]

নিবন্ধিত ডাক্তারদের বেসরকারি প্র্যাকটিসে পরামর্শ ফি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনা ও তদারকি সংক্রান্ত আইন: নিবন্ধনকৃত ডাক্তারদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস এবং বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার পরিচালনায় 'দি মেডিকেল প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্রাইভেট ক্লিনিক অ্যান্ড ল্যাবরেটরিজ (রেগুলেশন) (অর্ডিন্যান্স) ১৯৮২' জারি করা হয়, এবং পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালে কিছু সংশোধনী আনা হয়।[২৯] এ অধ্যাদেশে অফিসের সময় প্রাইভেট মেডিকেল প্র্যাকটিস না করা, চেম্বার-এর রক্ষণাবেক্ষণ, পরীক্ষার চার্জ ও ডাক্তারের ফি প্রদর্শন, প্রাইভেট ক্লিনিক স্থাপনে লাইসেন্সের শর্তাবলী, লাইসেন্সের জন্য আবেদন, পরিদর্শন, শাস্তি এবং বেসরকারি হাসপাতাল/ ক্লিনিক/ ডায়াগনস্টিক সেন্টার স্থাপনে লাইসেন্সের জন্য শর্তাবলী সম্পর্কে বলা হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হাসপাতাল ও ক্লিনিক শাখার অধীন বেসরকারি হাসপাতাল ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলোর লাইসেন্স প্রদান/ নবায়নসহ মান নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত তদারকি কার্যক্রম পরিচালিত হয় এ অধ্যাদেশের মাধ্যমে।

২.৩ আইনি কাঠামোর সীমাবদ্ধতা ও প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ

২.৩.১ জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১১

জাতীয় স্বাস্থ্যনীতিতে উল্লিখিত মূল লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে কিছু কর্মকৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। বিশ্লেষণে দেখা যায়, নীতির কোনো কোনো কৌশল বাস্তবায়নে যুগোপযোগী আইন/বিধিমালা তৈরিতে ঘাটতি রয়েছে। যেমন-

- অনুচ্ছেদ ১৪ অনুযায়ী স্বাস্থ্যসেবার সাথে সম্পৃক্ত সকলের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য নীতিমালা বা আইন প্রণয়ন করার কথা বলা হলেও তা গ্রহণে উদ্যোগের অভাব রয়েছে।
- অনুচ্ছেদ ১৬ অনুযায়ী বেসরকারি পরীক্ষা-নিরীক্ষাসহ অন্যান্য চিকিৎসা ব্যয় সহনীয় পর্যায়ে রাখার ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হলেও এখনো কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয় নি।
- অনুচ্ছেদ ২৩ অনুযায়ী সকল স্তরের হাসপাতাল বর্জ্যের নিরাপদ, পরিবেশবান্ধব ও ব্যয়সাশ্রয়ী ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা সম্পর্কে বলা হলেও এ বিষয়ে অগ্রগতি খুব সামান্য।

২.৩.২ কোড অব মেডিকেল এথিকস

ডাক্তার ও সংশ্লিষ্টদের জন্য রয়েছে কোড অব মেডিকেল এথিকস। রোগীর প্রতি পেশাগত দায়িত্ব পালনে অবহেলা এবং অসদাচরণ ঘটলে এই এথিকস-এর অধীনে ডাক্তারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যায়। কার্যত দেখা যায় কোড অব মেডিকেল এথিকস-এর ধারা ৫ (এ) অনুযায়ী অভিযুক্ত ডাক্তারদের[৩০] বিরুদ্ধে নিবন্ধন বাতিল সম্পর্কে নির্দেশনা থাকলেও এর বাস্তবায়ন খুবই সীমিত। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন সভাপতি জানান, এ পর্যন্ত মাত্র দু'জন চিকিৎসকের নিবন্ধন বাতিল করা হয়েছে। চিকিৎসকের অবহেলার কারণে কোনো রোগীর মৃত্যু বা ক্ষতি হলে তাঁর বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে আইনের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। অর্থাৎ পৃথক কোনো আইন নেই।

২.৩.৩ দি মেডিকেল প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্রাইভেট ক্লিনিক অ্যান্ড ল্যাবরেটরিজ (রেগুলেশন) (অর্ডিন্যান্স) ১৯৮২

- এ আইনের ধারা ১১ (১)-এ নিবন্ধনকৃত ডাক্তারদের চেম্বার ও বেসরকারি ক্লিনিক বিধি অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে কিনা বা বিধি অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা তা মহাপরিচালক (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর) অথবা তার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনের কথা উল্লেখ থাকলেও পরিদর্শন কার্যক্রমের পর্যায়কাল সম্পর্কে উল্লেখ করা হয় নি। এর ফলে দেখা যায় বেসরকারি ক্লিনিকগুলোতে পরিদর্শন নিয়মিত হয় না।

---

[২৭] স্মারক নং-স্বাপকম/ প্রশা-১/২সি-০৭/২০০৮(অংশ-১)/৪৪৪; বিস্তারিত জানতে দেখুন, www.mohfw.gov.bd (accessed on 20/06/2014)

[২৮] www.mohfw.bd.gov (accessed on 10/01/2013)

[২৯] সংশোধনীতে ডাক্তারদের পরামর্শ ফি, পরামর্শ ফি'র তালিকা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার মূল্যের তালিকা দৃষ্টিগোচর স্থানে প্রদর্শন সম্পর্কে বলা হয়।

[৩০] www.bma.org.bd

- ধারা ৩, শিডিউল এ (২)-অনুসারে কিছু কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মূল্য বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে বাস্তবসম্মত নয়। যেমন ইএসআর- ৮ টাকা, হিমোগ্লোবিন- ৮ টাকা, ব্লাড ক্রিটিনিন- ৩০ টাকা। পরবর্তীতে কয়েকটি ধারায় সংশোধনী আনা হলেও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মূল্য সম্পর্কিত কোনো সংশোধনী আনা হয় নি। ফলে স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে রোগীর কাছ থেকে অতিরিক্ত মূল্য আদায়ের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে এবং প্রতিষ্ঠানভেদে মূল্যের ব্যাপক তারতম্য পরিলক্ষিত হচ্ছে।
- ধারা ১৩ (২)-এ আইনের কোনো ধারা লজ্ঘনজনিত শাস্তি সর্বোচ্চ ছয় মাসের কারাবাস বা পাঁচ হাজার টাকা অথবা উভয়ই, যা বর্তমান প্রেক্ষাপটে পর্যাপ্ত নয়। শাস্তির পরিমাণ কম হওয়ায় আইনের বিভিন্ন ধারা লজ্ঘনের প্রবণতা অব্যাহত থাকে। এ প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞরা বলেন, যেহেতু আইনটি অনেক পুরাতন, সেহেতু শাস্তির পরিমাণ কম।

২.৩.৪ দি মেডিকেল প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্রাইভেট ক্লিনিকস্ অ্যান্ড ল্যাবরেটরিজ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অর্ডিনেন্স- ১৯৮৪

- ১৯৮২ সালের অর্ডিনেন্সে নিবন্ধনকৃত মেডিকেল প্র্যাকটিশনারদের মেডিক্যাল পরামর্শ ফি সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে এ সংক্রান্ত শিডিউল এ (১) ধারাটি সংশোধনীর ধারা ৫-এর মাধ্যমে বাতিল করা হয়। পরামর্শ ফি'র কোনো উর্ধ্বসীমা না থাকায় ডাক্তার ভেদে উচ্চ ফি আদায়ের প্রবণতা লক্ষ করা যায়।
- ১৯৮২ সালের অর্ডিন্যান্সে উল্লিখিত বেসরকারি চিকিৎসায় পরামর্শ ফি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মূল্যের তালিকা দৃষ্টিগোচর স্থানে প্রদর্শন সংক্রান্ত ধারা ৭ উপরোক্ত সংশোধনীর ধারা ৪ অনুযায়ী শিথিল করা হয়েছে।
- ১৯৮২ সালের অর্ডিনেন্সের ধারা ৭-এ বেসরকারি চিকিৎসায় পরামর্শ ফি এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার মূল্যের তালিকা ক্লিনিকগুলোতে দৃষ্টিগোচর স্থানে প্রদর্শনে বাধ্যবাধকতার (ডিম্যান্ডেড আন্ডার দিস অর্ডিনেন্স) কথা বলা হলেও পরবর্তীতে সংশোধনীর ধারা ৪ দ্বারা এটিকে শিথিল (ডিম্যান্ডেড বাই হিম অর ইট) করা হয়। এতে পরামর্শ ফি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মূল্য সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদের জানার সুযোগ সীমিত হয়ে যায়।

২.৩.৫ গণকর্মচারী শৃঙ্খলা (নিয়মিত উপস্থিতি) অধ্যাদেশ, ১৯৮২

এই অধ্যাদেশের ধারা ৪, ৫, ও ৬-এ বিনানুমতিতে কাজে অনুপস্থিতি, বিনানুমতিতে অফিস ত্যাগ এবং বিনানুমতিতে বিলম্বে উপস্থিতির জন্য দণ্ড রয়েছে। তবে বাস্তবে এসব ধারার প্রয়োগ সীমিত। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সম্প্রতি কর্মস্থলে চিকিৎসকদের অনুপস্থিতিতে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং চিকিৎসকদের কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।[৩১] কিন্তু এই সাময়িক বরখাস্ত চিকিৎসকদের কর্মস্থলে সর্বদা অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে নি।

২.৩ স্বাস্থ্য খাতের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়: বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতের সার্বিক পরিকল্পনা, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে হয়। এ মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে রয়েছে **১১টি** বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ: ১) স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ২) পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ৩) ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর, ৪) স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ৫) সেবা অধিদপ্তর, ৬) জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট), ৭) স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট, ৮) রিভাইটালাইজেশন অব কমিউনিটি হেলথ কেয়ার ইনিশিয়েটিভ ইন বাংলাদেশ (কমিউনিটি ক্লিনিকস প্রকল্প) (আরসিএইচসিআইবি), ৯) এসেনসিয়াল ড্রাগ কোম্পানি লিমিটেড (ইডিসিএল), ১০) যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সংস্থা (টেমো), এবং (১১) ন্যাশনাল ইলেকট্রো-মেডিকেল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ (নিমিউ)। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন পাঁচটি নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা রয়েছে, যেগুলো স্বাস্থ্যখাতে চিকিৎসক, নার্স, ফার্মাসিস্টদের নিবন্ধন ও কার্যক্রম তদারকিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এসব সংস্থা হচ্ছে: ১) বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল (বিএমডিসি), ২) বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল (বিএনসি), ৩) স্টেট মেডিকেল ফ্যাকাল্টি (এসএমএফ), ৪) হোমিও, ইউনানি অ্যান্ড আয়ুর্বেদিক বোর্ড, এবং ৫) বাংলাদেশ ফার্মেসি কাউন্সিল (বিএফসি)।[৩২] তাছাড়া বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (বিএমএ) নামে চিকিৎসকদের একটি সংগঠন রয়েছে।

নিম্নে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ধীন[৩৩] বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল এবং স্বাস্থ্যখাতের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো একটি চিত্রের মাধ্যমে বর্ণনা করা হল।[৩৪]

---

[৩১] দায়িত্বে অবহেলা ও কর্মস্থলে অনুপস্থিতির কারণে বিগত পাঁচ বছরে সিভিল সার্জনসহ বেশ কয়েকজন চিকিৎসকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। বিস্তারিত জানতে দেখুন *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৪।

[৩২] স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, *স্বাস্থ্য বুলেটিন* ২০১৩।

[৩৩] স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় দুটি পৃথক নির্বাহী কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে থাকে; স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর।

[৩৪] স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১০-২০১১ হতে ২০১১-২০১২)।

চিত্র ২.১: স্বাস্থ্যখাতের কাঠামো

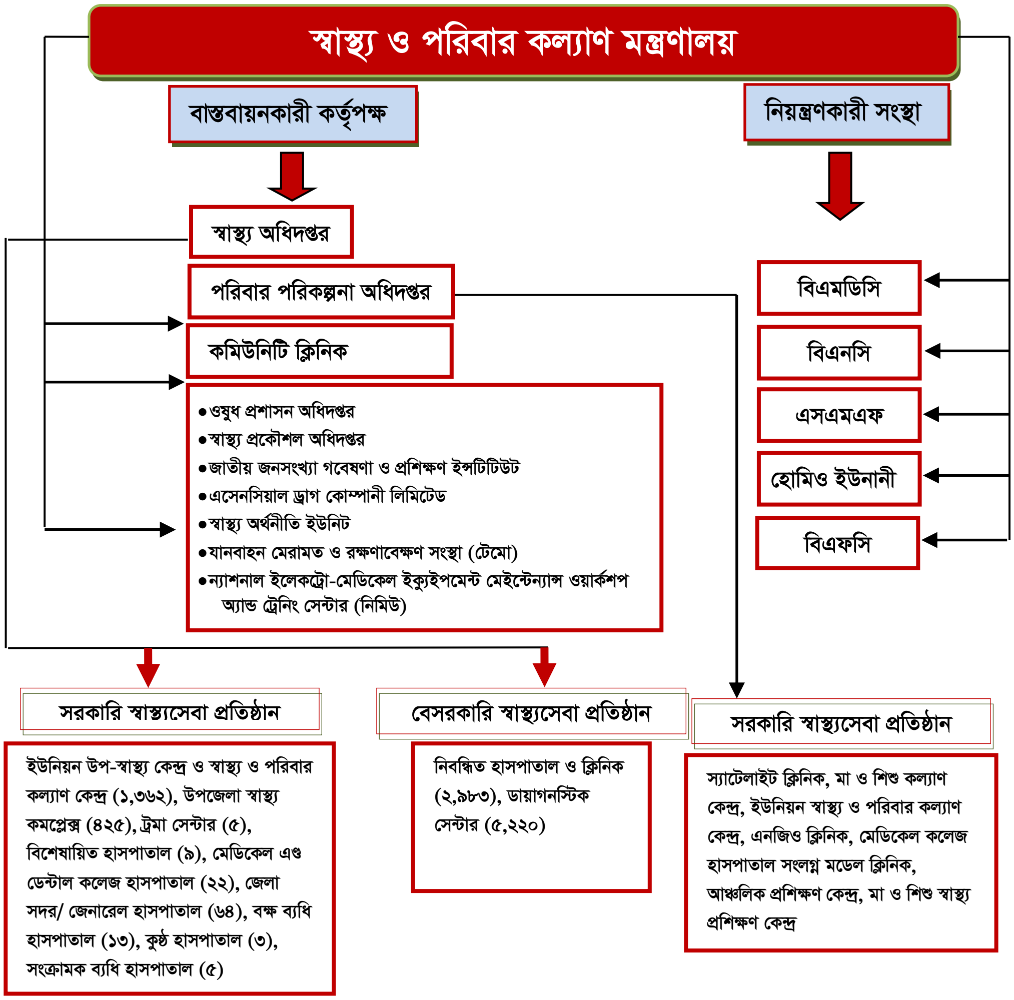

২.৩.১ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর: ১৯৫৮ সালে প্রতিষ্ঠিত স্বাস্থ্য পরিদপ্তর ১৯৮০ সালে অধিদপ্তরে উন্নীত হয়। বর্তমানে এর অনুমোদিত জনবল ১,১৫,৯৩৫। কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তৃত সকল সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে সমন্বয় সাধন করে মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবায় প্রধান সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান হচ্ছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীন বিভিন্ন পর্যায়ে সরকারি স্বাস্থ্যসেবায় রয়েছে প্রাথমিক, দ্বিতীয়, ও তৃতীয় পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা। প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স (৪২৫টি), ৩১ শয্যাবিশিষ্ট (পাঁচটি), ও ৩০ শয্যাবিশিষ্ট (একটি) হাসপাতাল, এবং ২০ শয্যাবিশিষ্ট (পাঁচটি) ট্রমা সেন্টার। ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র (১,২৭৫টি), ইউনিয়ন স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (৮৭টি), এবং ২০ শয্যাবিশিষ্ট (১৮টি) ও ১০ শয্যাবিশিষ্ট (১৩টি) হাসপাতাল। দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে জেলা সদর/জেনারেল হাসপাতাল (৬৪টি)। তৃতীয় পর্যায়ে রয়েছে বিশেষায়িত হাসপাতাল (২৭টি), এক বা একাধিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (২৫টি), এবং সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল (৭টি)।[৩৫] ৪৫টি জেলা পর্যায়ের হাসপাতালে হোমিও, ইউনানি ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকেরা বহির্বিভাগীয় চিকিৎসাসেবা দিয়ে থাকে।[৩৬] স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীন বেসরকারি পর্যায়ে চিকিৎসাসেবায় রয়েছে নিবন্ধিত বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টার।

২.৩.২ পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর: পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মূল উদ্দেশ্য সমগ্র বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সহনীয় পর্যায়ে রাখা। মা ও শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস করাসহ দেশের জনসাধারণ বিশেষত অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে দীর্ঘ মেয়াদী পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে সেবা প্রদান ও সচেতনতা বৃদ্ধি করে তাদের জ্ঞান, আচরণ ও স্বাস্থ্য চর্চার উন্নতির মাধ্যমে সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যমান অর্জন করা এবং সার্বিকভাবে দারিদ্র দূরীকরণে সহায়তা করা।

[৩৫] এখান হতে জরুরি, বহির্বিভাগ ও অন্তর্বিভাগীয় চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়।
[৩৬] উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হতে জরুরি বিভাগ, বহির্বিভাগ এবং অন্তর্বিভাগীয় চিকিৎসাসেবা প্রদান এবং এখান হতে রক্ত ও মল-মূত্রের প্যাথলজি পরীক্ষা ও এক্স-রে করার সুযোগ রয়েছে।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে বাংলাদেশে ১৯৫৩ সালে প্রথম স্বেচ্ছামূলক উদ্যোগে গঠিত হয় পরিবার পরিকল্পনা সমিতি। ১৯৬৫ সালে সরকারি পর্যায়ে জোরালোভাবে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা কাউন্সিল গঠন করা হয়। প্রাদেশিক পর্যায়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে জাতীয় পরিবার পরিকল্পনা বোর্ড এবং জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে জেলা পরিবার পরিকল্পনা বোর্ড গঠিত হয়। ১৯৭৪ সালে বোর্ড বিলুপ্ত করে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্বতন্ত্র পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ গঠন করা হয়। ১৯৭৫ সালে জাতীয় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ পরিদপ্তর গঠিত হয় এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়। ১৯৭৬ সালে সরকার জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধিকে দেশের একমাত্র সমস্যা বলে ঘোষণা করে এবং একই বছর 'জাতীয় জনসংখ্যা নীতির রূপরেখা' অনুমোদন করে।[৩৭] পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে অধিদপ্তর থেকে শুরু করে বিভাগ, জেলা, উপজেলা/থানা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যন্ত ৫২,৪৩০টি অনুমোদিত পদ বিদ্যমান, যার মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ে মা ও শিশু স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা দেওয়া হচ্ছে।[৩৮]

এ অধিদপ্তরের মূল সেবাসমূহের মধ্যে রয়েছে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক সেবা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ক সেবা, ডাক্তার এবং প্যারামেডিক্সদের বিভিন্ন ধরনের ক্লিনিক্যাল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এবং অন্যান্য সেবা (প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা, আল্ট্রাসনোগ্রাফি, কাউন্সেলিং)।[৩৯] ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং উপজেলা এবং জেলা পর্যায়ে মা ও শিশু স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা থেকে বিনামূল্যে গর্ভবতীর সেবা, সাধারণ রোগীর সেবা, পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের সেবা, ইপিআই সেবা, ভিটামিন এ ক্যাপসুল বিতরণ, পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক পরামর্শ প্রদান, স্বাস্থ্য শিক্ষামূলক সেবা, প্রয়োজনে উচ্চতর সেবা কেন্দ্রে প্রেরণ প্রভৃতি ধরনের সেবা দেওয়া হয়। স্যাটেলাইট ক্লিনিক থেকেও একই ধরনের সেবা দেওয়া হয়। অধিকন্তু বাড়িতে স্বাভাবিক প্রসব সেবা, নবজাতকের সেবা, এবং জটিল রোগী শনাক্তকরণ ও যথাযথ সেবা কেন্দ্রে প্রেরণ প্রভৃতি ধরনের সেবা দেওয়া হয়। এ কেন্দ্র থেকে পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাদের ধাত্রীবিদ্যায় জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য মিডওয়াইফারি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।[৪০]

২.৩.৩ ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর: ১৯৭৬ সালে ওষুধ প্রশাসনের যাত্রা শুরু হয়। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন, নিবন্ধন, পরিদর্শন ও মাঠ পর্যায়ে তদারকি কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যে ২০১০ সালে ওষুধ প্রশাসন পরিদপ্তরকে সংযুক্ত দপ্তর হিসেবে অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়। এ অধিদপ্তরের কার্যক্রম পরিচালনায় অনুমোদিত ৩৭০টি পদ রয়েছে। ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর ওষুধের কাঁচামাল ও মোড়ক দ্রব্যাদির আমদানি থেকে শুরু করে সকল ধরনের ওষুধের উৎপাদন, প্রস্তুতকৃত ওষুধের আমদানি, রপ্তানি, বিতরণ, বিক্রয়, মূল্য নিয়ন্ত্রণ, বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণ ও মান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করে এবং মান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ওষুধের নমুনা সংগ্রহ ও ওষুধের কারখানা, ডিপো ও খুচরা ওষুধের দোকান পরিদর্শনসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। দেশে বর্তমানে ৮২৩টি ওষুধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ও প্রায় এক লক্ষ ওষুধের দোকান রয়েছে।[৪১]

২.৩.৪ স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর: স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব প্রকৌশল সংস্থা। ২০১০ সালে প্রাক্তন প্রকৌশল ইউনিট সিএমএমইউকে একটি পূর্ণাঙ্গ ইউনিট হিসেবে স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়। স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কার্যক্রম পরিচালনায় অনুমোদিত ৪৯১টি পদ রয়েছে।[৪২] এই অধিদপ্তরের প্রধান দায়িত্ব ওয়ার্ড পর্যায় থেকে জেলা পর্যায়ের ১০০ শয্যা পর্যন্ত হাসপাতাল ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়নসহ বিদ্যমান অবকাঠামোর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে জেলা হাসপাতাল, জাতীয় পর্যায়ের হাসপাতাল, বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণ, উন্নীতকরণ, সম্প্রসারণ ও মেরামত সংস্কার ইত্যাদি।

২.৩.৫ সেবা পরিদপ্তর: ১৯৭৭ সালে সেবা পরিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়।[৪৩] নিরাপদ, কার্যকর ও নির্ভরযোগ্য স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে এই পরিদপ্তর নার্সিং শিক্ষা ও সার্ভিসের মানোন্নয়ন সংক্রান্ত সকল পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, মূল্যায়নসহ যাবতীয় প্রশাসনিক ও আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করে। বেসামরিক ক্ষেত্রে নার্সিং পেশায় নিয়োজিত ডিপ্লোমাধারী নার্সদের (সিনিয়র স্টাফ

---

[৩৭] বিস্তারিত www.dgfpbd.org, (accessed on 24/06/ 2014)

[৩৮] স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, *বার্ষিক প্রতিবেদন* (২০১২-২০১৩)।

[৩৯] স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, *বার্ষিক প্রতিবেদন* (২০১০-২০১১ হতে ২০১১-২০১২)।

[৪০] বিস্তারিত জানতে দেখুন, www.dgfpbd.org, (accessed on 24/06/ 2014)

[৪১] *প্রাগুক্ত*।

[৪২] *প্রাগুক্ত*। উল্লেখ্য, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন ১০০ শয্যার বেশি জেলা হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বিশেষায়িত হাসপাতাল, বিভিন্ন স্বাস্থ্য ইন্সটিটিউট নির্মাণ, উন্নীতকরণ, সম্প্রসারণ ও মেরামত সংস্কারের কাজ বাস্তবায়ন করে গণপূর্ত অধিদপ্তরের স্বাস্থ্য উইং।

[৪৩] Order No P-II/1C-18/77/391, 14/5/1977

নার্স, স্টাফ নার্স, পাবলিক হেলথ নার্স ও নার্স) পদমর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১১-১২ অর্থবছরে তৃতীয় শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়।[৪৪] বর্তমানে এই পরিদপ্তরের অনুমোদিত পদ ২৪,০৪২টি।

২.৩.৬ জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট (নিপোর্ট): ১৯৭৭ সালে নিপোর্টের কার্যক্রম শুরু হয়। জাতীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিপোর্ট প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ব্যবস্থাপক, সেবা প্রদানকারী, প্যারামেডিক্স, মাঠ পর্যায়ের সুপারভাইজার ও মাঠকর্মীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি ও মনোভাব পরিবর্তনের মাধ্যমে স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা এবং পুষ্টি কর্মসূচি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিভিন্ন কোর্সের মাধ্যমে (ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, ক্লিনিক্যাল ব্যবস্থাপনা, এবং শিক্ষা, তথ্য ও যোগাযোগ) এসব প্রশিক্ষণ ও পুনঃপ্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বিভাগ/জেলা পর্যায়ে ১১টি পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট এবং উপজেলা পর্যায়ে ২০টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্যারামেডিক্স, ইউনিয়ন পর্যায়ে সেবা প্রদানকারী, মাঠ পর্যায়ের সুপারভাইজার এবং মাঠ কর্মীদের প্রশিক্ষণ পরিচালিত হচ্ছে। প্রজনন স্বাস্থ্য, শিশু স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে জোরদার করার জন্য কর্মসূচিভিত্তিক মূল্যায়নধর্মী এবং গবেষণা ও জরিপ পরিচালনা করা এবং কর্মসূচিকে উন্নয়নের জন্য গবেষণার ফলাফল কার্যকরভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে উপস্থাপন করা নিপোর্টের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। নিপোর্টের অনুমোদিত পদের সংখ্যা বর্তমানে ৮৬২টি।[৪৫]

২.৩.৭ যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সংস্থা (টেমো): ১৯৭৬ সালে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের রাজস্ব খাতভুক্ত যানবাহন মেরামত করার কাজ শুরু করে টেমো। এর অনুমোদিত পদ রয়েছে ৭৫টি। টেমোর পাঁচটি কারিগরি শাখার মধ্যে চারটি শাখা গাড়িসমূহের হালকা ও ভারি মেরামত কাজ সম্পাদন করে, এবং একটি শাখা গাড়ির ইলেকট্রনিক কাজ সম্পাদন করে।[৪৬]

২.৩.৮ ন্যাশনাল ইলেকট্রো-মেডিকেল ইকুইপমেন্ট মেইন্টেন্যান্স ওয়ার্কশপ অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার (নিমিউ অ্যান্ড টিসি): ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত নিমিউ বাংলাদেশের সকল সরকারি হাসপাতালের মেডিকেল যন্ত্রপাতি[৪৭] মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও স্থাপন করা এবং মেডিকেল যন্ত্রপাতি ব্যবহারকারীদের সুষ্ঠুভাবে যন্ত্রপাতি ব্যবহারের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জনবলকে প্রশিক্ষণ দেয়।[৪৮] বর্তমানে এটির কার্যক্রম পরিচালনায় ছয়টি শাখায় অনুমোদিত পদ ৯৫টি।[৪৯]

২.৩.৯ এসেনসিয়াল ড্রাগ কোম্পানি লিমিটেড (ইডিসিএল): এটি একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি। এর প্রধান উদ্দেশ্য মানসম্পন্ন ওষুধ প্রস্তুত করা এবং সরকারি হাসপাতাল এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে তা সরবরাহ করা।[৫০] **১৯৮৩ সালে ইডিসিএল প্রতিষ্ঠিত হয়। এর বর্তমান অনুমোদিত পদ ২,৫৩০টি।**[৫১]

২.৩.১০ স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট: স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা খাতের বিভিন্ন নীতি ও কর্মকৌশল প্রণয়ন এবং এজন্যে প্রয়োজনীয় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা ও মূল্যায়নের জন্য স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ স্বাস্থ্য অর্থনীতি পলিসি অ্যানালাইসিস কার্যক্রম প্রবর্তনের জন্যে সরকার চতুর্থ জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্য প্রকল্পের (এফপিএইচপি) অধীনে স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট[৫২] শীর্ষক প্রকল্পের যাত্রা শুরু করে। জুন ১৯৯৮ এফপিএইচপি প্রকল্প সমাপ্তি শেষে স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা খাতকর্মসূচি (১৯৯৮-২০০৩), স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতকর্মসূচি (২০০৩-২০১১), এবং স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাত উন্নয়ন কর্মসূচিতে এ ইউনিটকে অন্তর্ভুক্ত করে এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ১৯৯৯ সালের জুলাইতে স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা খাত কর্মসূচির আওতায় জেন্ডার, এনজিও অ্যান্ড স্টেকহোল্ডার পার্টিসিপেশন (জিএনএসপি) ইউনিট কার্যক্রম শুরু করে। এ ইউনিটের মূল কাজ জেন্ডার সমতা সম্পর্কিত তথ্য প্রবাহ শক্তিশালীকরণ, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং এ বিষয়ক বিদ্যমান নীতিমালা পর্যালোচনা ও হালনাগাদকরণ। এ ইউনিটের অধীন মোট জনবল ১০টি।[৫৩]

---

[৪৪] স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, *বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১২-২০১৩)*।

[৪৫] *প্রাগুক্ত*।

[৪৬] *প্রাগুক্ত*।

[৪৭] এক্স-রে, রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশন, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল।

[৪৮] স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, *বার্ষিক প্রতিবেদন* (২০১০-১১ হতে ২০১১-১২)।

[৪৯] *প্রাগুক্ত*।

[৫০] www.edcl.gov.bd, (accessed on 24/06/2014)

[৫১] এসেনসিয়াল ড্রাগ কোম্পানী লিমিটেড, ঢাকা প্ল্যান্ট (১৪১১), এসেনসিয়াল ড্রাগ কোম্পানী লিমিটেড, বগুড়া প্ল্যান্ট (৫৬৬), খুলনা এসেনসিয়াল লেটেক্স প্ল্যান্ট, খুলনা প্ল্যান্ট (৪৯৭), ইসেনসিয়াল লেটেক্স প্রসেসিং প্ল্যান্ট, মধুপুর প্ল্যান্ট (৫৬)।

[৫২] স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট এর অধীন দুটি ইউনিট রয়েছে; একটি স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট, অন্যটি জিএনএসপি ইউনিট।

[৫৩] বিস্তারিত জানতে দেখুন, www.heu.gov.bd (accessed on 20/06/2014)

২.৩.১১ কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্প: ১৯৯৬ সালে সরকার কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্র থেকে 'অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্যাকেজ' এর মাধ্যমে সমন্বিত স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা গ্রামীণ জনগণের দোরগোড়ায় পৌছে দেওয়ার লক্ষ্যে ওয়ার্ড পর্যায়ে 'কমিউনিটি ক্লিনিক' স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ২০০১ সালে সরকার পরিবর্তনের পর কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো বন্ধ হয়ে যায় এবং ২০০৯ সাল পর্যন্ত এ অবস্থা অব্যাহত থাকে। পরবর্তীতে সরকার পরিবর্তন হয়েছে এবং নতুন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর অগ্রাধিকার ভিত্তিতে রিভাইটালাইজেশন অব কমিউনিটি হেলথ কেয়ার ইনিশিয়েটিভস ইন বাংলাদেশ (আরসিএইচসিআইবি) শীর্ষক পাঁচবছর মেয়াদী (জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১৪) কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্পের কার্যক্রম পুনরায় শুরু করে। প্রকল্প কার্যালয়ে অনুমোদিত পদ ৪৪টি এবং কমিউনিটি ক্লিনিক পর্যায়ে ১৩,৫০০টি (কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার) পদ রয়েছে।[৫৪] এ প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে প্রতি ছয় হাজার জনগোষ্ঠীর জন্য একটি করে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন এবং সেবাদান[৫৫] কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। **বর্তমানে ওয়ার্ড পর্যায়ে রয়েছে ১২,৫২৭টি কমিউনিটি ক্লিনিক।** ২০০৯ এর এপ্রিল থেকে ২০১৩ এর অক্টোবর পর্যন্ত কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্প হতে সেবাগ্রহণকারীর সংখ্যা প্রায় ২২ কোটি এবং উচ্চতর পর্যায়ের স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে রেফার্ডকৃত প্রায় ৬০ লক্ষ।

২.৩.১২ বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল (বিএমডিসি): বাংলাদেশ মেডিকেল কাউন্সিল প্রথম গঠিত হয় বাংলাদেশ মেডিকেল কাউন্সিল আইনের (১৯৭৩) অধীন। পরবর্তীতে এই আইনটি বাতিল করে 'বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল আইন, ২০১০' শীর্ষক নতুন আইন প্রণয়ন করা হয়।[৫৬] বিএমডিসি শিক্ষার্থীদের নিবন্ধন, স্বীকৃত মেডিকেল ও ডেন্টাল চিকিৎসকদের নিবন্ধন, স্বীকৃত মেডিকেল প্রতিষ্ঠান ও স্বীকৃত ডেন্টাল প্রতিষ্ঠানের ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের নিবন্ধন দিয়ে থাকে। এছাড়া নিবন্ধন সনদ দেওয়া সংক্রান্ত পরীক্ষা গ্রহণ, পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি, মেডিকেল প্রতিষ্ঠান ও ডেন্টাল প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের জন্য শিক্ষকদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার মান নির্ধারণ প্রভৃতি কার্যাবলী সম্পাদন করে।[৫৭]

২.৩.১৩ বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল (বিএনসি): নার্সদের নিবন্ধন, নিবন্ধনকৃত নার্স, মিডওয়াইভস, সহকারী নার্সসহ অন্যান্যদের নিবন্ধন রক্ষণাবেক্ষণ, পেশাগত চর্চার স্বীকৃতি, শিক্ষা কারিকুলাম, পাঠ্যসূচি নির্ধারণ ও পর্যালোচনা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিদর্শনসহ অসদাচরণের অভিযোগ তদন্ত এবং এর ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ প্রভৃতি কার্যক্রম বিএনসি সম্পাদন করে। এ সকল কার্যক্রম বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল অর্ডিন্যান্স ১৯৮৩ এর মাধ্যমে সম্পাদিত। বিএনসি'র মোট জনবল ২৫।

২.৩.১৪ বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা অনুষদ (স্টেট মেডিকেল ফ্যাকাল্টি - এসএমএফ): ১৯১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এসএমএফ'এর অনুমোদিত জনবল ২৪। এর অধীন প্যারা-মেডিকেল কোর্স, মেডিকেল সহকারীদের প্রশিক্ষণ কোর্স, এবং পল্লী চিকিৎসকদের কোর্স এবং ডিপ্লোমা সনদ দেওয়া হয়। এছাড়া মেডিকেল সহকারী, পল্লী চিকিৎসক এবং টেকনিশিয়ানদের (হেলথ অ্যান্ড স্যানিটারি, ল্যাবরেটরি মেডিসিন, রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিং, ডেন্টিস্ট্রি, স্যানিটারি ইন্সপেক্টরশিপ, ফিজিওথেরাপি, রেডিওথেরাপি, পেশাগত থেরাপি) পাঠ্যসূচি প্রণয়ন এবং পরীক্ষা পরিচালনা করা হয়।[৫৮]

২.৩.১৫ হোমিও, ইউনানি অ্যান্ড আয়ুর্বেদিক বোর্ড: বাংলাদেশ বোর্ড অব ইউনানি অ্যান্ডআয়ুর্বেদিক সিস্টেম অব মেডিসিন এবং বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক বোর্ড কর্তৃক অলটারনেটিভ মেডিসিন বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের ডিপ্লোমা সনদপত্র দেওয়া হয়। অল্টারনেটিভ মেডিসিন বিষয়ে শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের জন্য স্নাতক পর্যায়ে তিনটি[৫৯] মেডিকেল কলেজ এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ১২টি ইউনানী ডিপ্লোমা কলেজ, আটটি আয়ুর্বেদিক ডিপ্লোমা কলেজ ও ৪১টি হোমিওপ্যাথিক ডিপ্লোমা কলেজ রয়েছে। **মোট অনুমোদিত জনবল ১,৪৬৪।**[৬০]

---

[৫৪] বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১২-২০১৩), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

[৫৫] কমিউনিটি ক্লিনিক হতে প্রদেয় স্বাস্থ্যসেবার মধ্যে রয়েছে- মাতৃ স্বাস্থ্য সেবা, সমন্বিত শিশু স্বাস্থ্য সেবা, প্রজনন স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা সেবা, নবদম্পতি, গর্ভবতী মা এবং জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন, পুষ্টি ও অপুষ্টি শিক্ষা, অসংক্রামক রোগ (উচ্চরক্তচাপ, ডায়াবেটিস ইত্যাদি চিহ্নিতকরন), উচ্চতর পর্যায়ের (উপজেলা ও জেলা) প্রতিষ্ঠানের সাথে একটি রেফারেল পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা, বিভিন্ন মারাত্মক রোগ (যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া, নিউমোনিয়া, জরুরি প্রসূতি সমস্যা) চিহ্নিতকরণ, সাধারণ ডেলিভারি পরিচালনা প্রভৃতি।

[৫৬] **১৯৭৩** সালের বাংলাদেশ মেডিকেল কাউন্সিল আইনটি বাতিল করা হয় এবং **১৯৮০** সালে বাংলাদেশ মেডিকেল এণ্ড ডেন্টাল কাউন্সিল আইন **১৯৮০** শীর্ষক বিল সংসদে পাশ হয়। পরবর্তীতে এটি রহিত করে বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আইন, ২০১০ প্রণীত হয়।

[৫৭] www.bmdc.org.bd (accessed on 23/06/2014)

[৫৮] বিস্তারিত জানতে দেখুন, www.smf.edu.bd (accessed on 11/06/2014)

[৫৯] সরকারি ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক ডিগ্রি কলেজ এবং হোমিওপ্যাথিক ডিগ্রি কলেজ।

[৬০] স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, *স্বাস্থ্য বুলেটিন* ২০১৩।

২.৩.১৬ বাংলাদেশ ফার্মেসি কাউন্সিল: এটি ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বর্তমানে একজন সভাপতিসহ মোট ১৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছে।[৬১] এই কাউন্সিল শিক্ষার্থী ও ফার্মাসিস্টদের পেশাগত নিবন্ধন সনদ দেওয়া, ফার্মেসি বিষয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি প্রক্রিয়া এবং পরীক্ষার জন্য শর্ত ও পদ্ধতি নির্ধারণসহ ফার্মাসিস্টদের নিবন্ধন সংরক্ষণ করে।[৬২]

২.৩.১৭ বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (বিএমএ): ১৯৫৬ সালে তৎকালীন পাকিস্তানের চিকিৎসকেরা 'পাকিস্তান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি সংগঠন করে, যার আওতায় পূর্ব পাকিস্তানের চিকিৎসকেরাও 'পাকিস্তান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (পূর্বাঞ্চল)' নামে আঞ্চলিক ভিত্তিতে নিজেদেরকে সংগঠিত করে। স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ সালের ১৪ জানুয়ারি এক সাধারণ সভায় নতুন গঠনতন্ত্রের মাধ্যমে 'বাংলাদেশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন' নামকরণ করা হয়।[৬৩] বিএমএ স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে পেশাজীবী সংগঠন হিসেবে চিকিৎসাসেবা যথাযথভাবে দেওয়ার মাধ্যমে জনসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে চিকিৎসকদের নৈতিকতা অনুশীলনের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা, চিকিৎসকদের প্রয়োজনে আইনি সহায়তা দেওয়া, এবং এই পেশায় নতুনদের পেশা সম্পর্কিত পরামর্শ ও সাহায্য দিয়ে থাকে।

২.৪ স্বাস্থ্য খাতের আর্থিক ব্যবস্থাপনা

২.৪.১ জাতীয় বাজেটে স্বাস্থ্যখাতে মোট বরাদ্দ: সাম্প্রতিক কয়েক বছরের জাতীয় বাজেট পর্যালোচনা করে দেখা যায়, স্বাস্থ্য খাতে টাকার অংকে বরাদ্দ বাড়লেও শতাংশের হিসাবে ক্রমান্বয়ে কমছে।[৬৪] ২০০৮-০৯ অর্থবছরে যেখানে বরাদ্দ ছিল ৬,১৯৬ কোটি টাকা যা জাতীয় বাজেটের ৬.৫৮ শতাংশ, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে স্বাস্থ্যখাতে ৯,৯৫৫ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হলেও তা ছিল জাতীয় বাজেটের ৪.৬ শতাংশে।[৬৫] বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতে ব্যয়ের পরিমাণ মোট জিডিপি'র ১ শতাংশ বা তারও কম, যা প্রতিবছর ক্রমান্বয়ে কমছে।[৬৬] উল্লেখ্য, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে ভালো মানের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য স্বাস্থ্যখাতে কমপক্ষে জিডিপি'র ৫ শতাংশ প্রয়োজন।[৬৭]

চিত্র ২.২: জাতীয় বাজেটে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ ও স্বাস্থ্যখাতের মোট জিডিপি

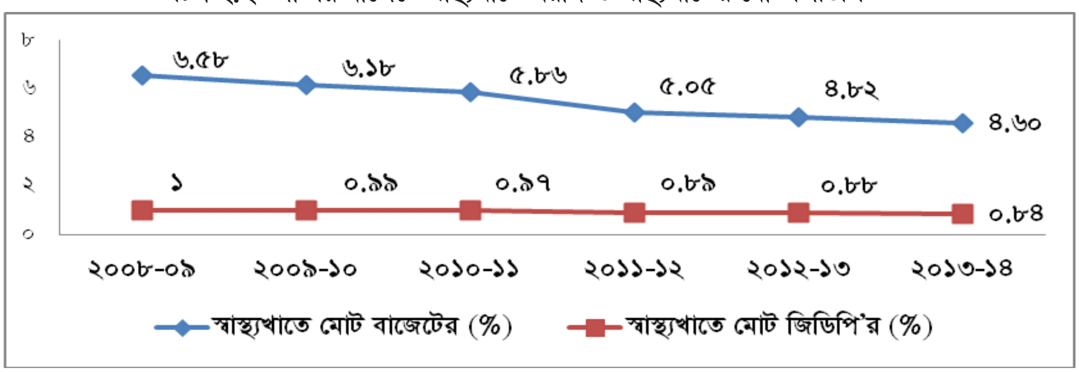

২.৪.২ স্বাস্থ্যখাতে অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন ব্যয় পর্যালোচনা: স্বাস্থ্যখাতের মোট বরাদ্দ পর্যালোচনায় দেখা যায়, অনুন্নয়ন ব্যয় অপেক্ষা উন্নয়ন ব্যয় ক্রমান্বয়ে কমছে।[৬৮] ২০০৮-০৯ অর্থবছরে এ খাতে উন্নয়ন ব্যয় মোট বরাদ্দের ৪২.২% থেকে কমে ২০১৩-১৪

---

[৬১] ফার্মেসি অর্ডিন্যান্স (Ordinance No. X111 of 1976) এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত।

[৬২] বিস্তারিত জানতে দেখুন, www.bps-bd.org (accessed on 11/06/2014).

[৬৩] বাংলাদেশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন, গঠনতন্ত্র, স্মারকলিপি, ধারা ও উপধারা সমূহ, তারিখ: ২২ অক্টোবর ২০০৪।

[৬৪] এ সম্পর্কে বিস্তারিত পরিশিষ্ট ৩-এ দেওয়া হল।

[৬৫] বাজেট বক্তৃতা (২০১৩-২০১৪), অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার; বিস্তারিত জানতে দেখুন, www.mof.gov.bd (accessed on 06/06/2013).

[৬৬] জিডিপি: ১,১৮১,০০০ কোটি টাকা (২০১৩-১৪), ১০,৩৭,৯৮৭ কোটি টাকা (২০১২-১৩), ৯১৪,৭৮৪ কোটি টাকা (২০১১-১২), ৭৮৭,৪৯৫ কোটি টাকা (২০১০-১১), ৬৯০,৫৭১ কোটি টাকা (২০০৯-১০), ৬১৪,৯৪৩ কোটি টাকা (২০০৮-০৯)। বিস্তারিত জানতে দেখুন, ২০১৩-১৪ এবং ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরের বাজেট বক্তৃতা। অনুসন্ধানের তারিখ: ১০/০৬/২০১৪।

[৬৭] World Health Organization, Geneva, 'Department Health System Financing, Expenditure and Resource Allocation' (FER) Cluster 'Evidence and Information for Policy' (EIP)Discussion Paper, number 2-2003. EIP/FER/DP.o3.2, জাতীয় বাজেটে স্বাস্থ্যসেবা খাতের একটি পর্যালোচনা; সদস্য সচিব- উন্নয়ন ধারা ট্রাস্ট, জাতীয় সেমিনার (বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সেবা ও জনগণের প্রত্যাশা); উবিনীগ, স্বাস্থ্য আন্দোলন; ২৪/১১/২০১৩।

[৬৮] অনুন্নয়ন ব্যয়ের মধ্যে রয়েছে- কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন, ভাতাদি, মেরামত ও সংরক্ষণ, যন্ত্রপাতি, ও অন্যান্য; উন্নয়ন ব্যয়ের মধ্যে রয়েছে- নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ/ মেরামত, যন্ত্রপাতি, বেতন-ভাতাদি, এবং অন্যান্য।

অর্থবছরে দাঁড়ায় ৩৮.৩%-তে। এইচএনপিএসপি'র মোট বরাদ্দ ৫৬,৯৯৩.৫৪ কোটি টাকা, এর মধ্যে অনুন্নয়ন বাজেট ৩৪,৮১৬.৮৮ কোটি এবং উন্নয়ন বাজেট ২২,১৭৬.৬৬ কোটি (জিওবি অবদান ৪৩,৪২০.৩৮ কোটি, ডিপি অবদান ১৩,৫৭৩.১৬ কোটি) টাকা।[৬৯] নিম্নে ২০০৮-০৯ অর্থ-বছর হতে ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরের অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন ব্যয় সম্পর্কে তুলে ধরা হল।

সারণি ২.১: স্বাস্থ্যখাতে অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন ব্যয় (২০০৮-০৯ হতে ২০১৩-১৪ অর্থবছর পর্যন্ত)

অর্থবছর	অনুন্নয়ন ব্যয় (কোটি টাকায়)	উন্নয়ন ব্যয় (কোটি টাকায়)	মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	মোট বরাদ্দ থেকে উন্নয়ন ব্যয়হ্রাস (%)
২০১৩-১৪	৬,১৩৯	৩,৮১৬	৯,৯৫৫	৩৮.৩৩
২০১২-১৩	৫,৫০৭	৩,৬২৩	৯,১৩০	৩৯.৬৮
২০১১-১২	৫,১১৪	৩,০৩৬	৮,১৫০	৩৭.২৫
২০১০-১১	৪,৮৮১	২,৭৩৬	৭,৬১৭	৩৫.৯২
২০০৯-১০	৪,০০৪	২,৮২৯	৬,৮৩৩	৪১.৪০
২০০৮-০৯	৩৫৮১	২৬১৫	৬,১৯৬	৪২.২০

তথ্যসূত্র: ২০০৮-০৯ হতে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বাজেট।

২.৪.৩ বিভিন্ন কর্মসূচিতে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার অবদান: স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়নে এ পর্যন্ত গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচিতে (এইচপিএসপি, এইচএনপিএসপি, এইচএনপিএসপি) সরকারের পাশাপাশি উন্নয়ন সহযোগীদের বিশেষ অবদান রয়েছে। তবে বৈদেশিক সহায়তার হার বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, তিনটি কর্মসূচিতে বরাদ্দকৃত তহবিলের বিপরীতে সরকারের বরাদ্দ ক্রমান্বয়ে বাড়লেও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার[৭০] অবদান ক্রমান্বয়ে কমছে। এর কারণ হিসেবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মর্তা জানান, বিভিন্ন খাতে বিশেষকরে প্রশিক্ষণ ও যন্ত্রপাতি এই দুইটি উপ-খাতে দুর্নীতি ও অনিয়ম বেশি হওয়ায় উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার অর্থহ্রাস পায় বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সহায়তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এতে বার্ষিক যে পরিকল্পনা থাকে তা বাস্তবায়নে যেমন ব্যাঘাত ঘটে, তেমনি উন্নয়ন কার্যক্রমও ব্যাহত হয়।

সারণি ২.২: সরকার এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার অবদান

কর্মসূচি	সময়	বাংলাদেশ সরকারের অবদান	উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার অবদান
এইচপিএসপি	১৯৯৮-২০০৩	৬২%	৩৮%
এইচএনপিএস	২০০৩-২০১১	৬৭%	৩৩%
এইচপিএনএসডিপি	২০১১-২০১৬	৭৬%	২৪%

তথ্যসূত্র: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, *স্বাস্থ্য বুলেটিন* ২০১৩।

২.৪.৪ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ: এইচএনপিএসডিপি'র আওতায় ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের জন্য মোট বরাদ্দ দেওয়া হয় ১৭৯,২১০.৯০ লাখ (১,৭৯২.১০ কোটি) টাকা। এর অধীন যে ৩২টি কার্যকর পরিকল্পনা (অপারেশনাল প্ল্যান- ওপি) চলমান রয়েছে তা পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রতিটি কার্যকর পরিকল্পনায় মোট বরাদ্দপ্রাপ্ত অর্থের বিপরীতে সবচেয়ে বেশি ব্যয় হয় রোগ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে (১০৫.৮%)। এরপরেই রয়েছে স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থা ও ইলেক্ট্রোনিক স্বাস্থ্যসেবায় (৯৯.৫%), এবং ক্রয় ও সরবরাহে (৯৮.৬%)। উপরে উল্লিখিত ওপিতে সরকারের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম গ্রহণ এবং অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। যেমন, রোগ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে যক্ষা, এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা, অ্যানথ্রাক্স, নিপাহ ভাইরাস্ সংক্রমন, সার্স, ডেঙ্গু, কালাজ্বর রোধে কার্যক্রম গ্রহণ করেন, এইচআইভি/এইড্স প্রতিরোধে গণসচেতনতা সৃষ্টি, এবং পোলিও সম্পূর্ণভাবে নির্মূল হয়। তাছাড়া সাধারণ জনগণের কাছে স্বাস্থ্যসেবা দ্রুত পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ইলেকট্রনিক স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন ঘটানো হয়। যেমন, সকল সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়া, এসএমএস এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত পরামর্শ দেওয়া প্রভৃতি কর্মকাণ্ড গ্রহণ করা হয়।[৭১]

২.৪.৫ হাসপাতাল পরিচালনায় অর্থ বরাদ্দ: হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনায় প্রতি বছরের জন্য আর্থিক বরাদ্দ একসাথে তৈরি করা হয়। প্রতিটি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের শয্যা অনুসারে কেন্দ্রীয়ভাবে আর্থিক ব্যবস্থাপনা হয়ে থাকে। প্রতিষ্ঠানগুলো বাজেট তৈরি করে তা কেন্দ্রীয় পর্যায়ে পাঠিয়ে দেয়। এসব বরাদ্দ কেন্দ্রীয়ভাবে নির্ধারিত হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়তা যাচাই সাপেক্ষে বছরের

[৬৯] স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, *স্বাস্থ্য বুলেটিন* ২০১৩, পৃষ্ঠা ১২১।

[৭০] স্বাস্থ্য খাতে সকল কার্যক্রম সফলতার সাথে পরিচালনার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে কাজ করছেন যার মধ্যে রয়েছে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এবং জাইকা (ক্রেডিট এবং গ্রান্টস); অন্যান উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার মধ্যে রয়েছে DFID, SIDA, USAID, CIDA, EC, AusAID, Kfw, WHO, UNICEF, UNFPA, GIZ, UNAIDS, GFATM, GAVI, etc. –grants).

[৭১] ওপি ভেদে বরাদ্দের বিবরণ পরিশিষ্ট ৩-এ দেওয়া হল।

বিভিন্ন সময়েও কিছু থোক বরাদ্দ দেওয়া হয়। বরাদ্দ অনুমোদনের পর সাধারণত তিন কিস্তিতে অর্থ দেওয়া হয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বাজেট শাখা থেকে অর্থ ছাড় করাতে হয়। তবে ভারি যন্ত্রপাতি, গাড়ি ইত্যাদি বাবদ অর্থ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় হতে ছাড় করাতে হয়। জুলাই মাস হতে বছর শুরু হলেও প্রথম ত্রৈমাসিক বরাদ্দ পেতে দুই থেকে তিন মাস সময় লেগে যায়।

২.৪.৬ স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে অর্থ ব্যয়ে ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা: জেলা পর্যায়ের হাসপাতালের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয় তার ব্যবহারের পূর্ণ ক্ষমতা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নেই। হাসপাতালের চিকিৎসা-সামগ্রী মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, অবকাঠামো সংস্কার ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য জরুরি প্রয়োজনে উক্ত অর্থ খরচ করার জন্য সিভিল সার্জন অনুমোদিত নন। তাছাড়া হাসপাতালের লাইট, ফ্যান, সুইচ ইত্যাদি মেরামতের ক্ষমতা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নেই। লাইট, ফ্যান, সুইচ ইত্যাদি নষ্ট হলে গণপূর্ত বিভাগের মাধ্যমে মেরামত করা হয়। এ প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট অংশীজন জানান, গণপূর্ত অধিদপ্তর থেকে মেরামতে অনেকক্ষেত্রেই কয়েকমাস (৪-৬ মাস বা তার বেশি) লেগে যায়। এর কারণ হিসেবে প্রায়ই বলা হয় যে তাদের ফান্ডের সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

২.৪.৭ প্রয়োজনের তুলনায় বরাদ্দের স্বল্পতা: স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনায় প্রয়োজনের তুলনায় বরাদ্দের স্বল্পতা রয়েছে। যেমন, অবকাঠামো ও লজিস্টিকস, ওষুধ বিতরণ, অ্যাম্বুলেন্স, জেনারেটর, মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও সেবা কার্যক্রমে। স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে দৈনন্দিন পরিচালনায় জেনারেটর থাকলেও তা জ্বালানির জন্য পর্যাপ্ত তেলের বরাদ্দ না থাকায় তা চালানো যায় না। আবার জেনারেটর থাকলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর ব্যাটারি নষ্ট থাকার কারণে কাজ করা যায় না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রসূতি বিভাগে অপারেশন লাইটের অভাবে অপারেশন পরিচালনা করা যায় না। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সামগ্রীর অভাব রয়েছে এবং এ খাতে বরাদ্দ কোনো কোনো ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত নয়। অ্যাম্বুলেন্স পরিচালনায়ও জ্বালানি তেলের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয় তা কোনো কোনো ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত নয় বলে সংশ্লিষ্ট অংশীজন হতে জানা যায়। তাছাড়া কম্পিউটার থাকলেও তার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজ বা কালি দেওয়া হয় না। রোগীদের প্রয়োজনীয় সকল ওষুধ হাসপাতাল হতে দেওয়া হয়, কিছু ওষুধ রোগীদের বাইরে থেকে কিনতে হয়।

২.৪.৬ আর্থিক কার্যক্রম নিরীক্ষা (অডিট)

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত উন্নয়ন কর্মসূচি (এইচপিএনএসডিপি) ৩২টি কার্য পরিকল্পনার মাধ্যমে সারা দেশে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই কার্য পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আর্থিক বরাদ্দ দেওয়া হয়, যেখানে বিশ্বব্যাংকসহ অন্যান্য দাতা সংস্থা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রতি বছর নিরীক্ষা হয়ে থাকে। প্রতিটি কার্য পরিকল্পনা নিরীক্ষায় সিএজি থেকে তিনি সদস্যবিশিষ্ট নিরীক্ষক দল থাকে। নিরীক্ষায় আপত্তি উত্থাপিত হলে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ত্রি-পক্ষীয় (এজি, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক) বৈঠকে কিছু আপত্তি নিষ্পত্তি হয়। যেগুলোতে আবার আপত্তি থাকে, সেগুলো এজি অফিস থেকে নিষ্পত্তি করা হয়। অন্যদিকে কোনো কোনো নিরীক্ষা আপত্তি পাবলিক একাউন্টস কমিটিতে উপস্থাপন করা হয়, সেখানেও কিছু নিষ্পত্তি হয়ে থাকে। অবশিষ্ট যেগুলো নিষ্পত্তি করা যায় না, সেগুলো কমিটির নির্দেশনার আলোকে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়।

২.৪.৬.১ নিরীক্ষা প্রতিবেদনে অনিয়মের ধরন: স্বাস্থ্যখাতের বিভিন্ন কার্য পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আর্থিক অনিয়ম সংগঠিত হয় যা নিরীক্ষা প্রতিবেদন হতে জানা যায়। নিরীক্ষা প্রতিবেদনে যে সকল ক্ষেত্রে আপত্তি উত্থাপিত হয় বেশি, সেগুলো হল, চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ক্রয়, অর্থাৎ যন্ত্রপাতি স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী না দেওয়া, প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যের যন্ত্রপাতি সরবরাহ, পিপিআর অনুসরন না করা, কম কাজ করে বেশি কাজ দেখানো, স্পট কোটেশনের মাধ্যমে ক্রয় প্রভৃতি। এ প্রসঙ্গে এক প্রতিদেন হতে জানা যায়, ১৬ সেপ্টেম্বর - ১৯ নভেম্বর ২০১২ পর্যন্ত ওপির আটটি কার্যালয় এবং মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে সিএজি'র ফাপাদ (ফরেন এইডেড প্রজেস্টস অডিট ডিরেক্টরেট) এবং ২০১১-১২ অর্থবছরে মোট ১৫১ কোটি টাকার অনিয়ম চিহ্নিত করে।[৭২] উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়, অসংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ কার্য পরিকল্পনায় এক বছরে ৯৬ লাখ ৬০ হাজার টাকার ফটোকপি করা হয় এবং এই ফটোকপির জন্য কোনো দরপত্র আহবান করা হয় নি, এমনকি উক্ত কার্যালয়ে ফটোকপির দুটি যন্ত্রও সচল ছিল; জাতীয় পুষ্টিসেবা (এনএনএস) সম্পর্কিত কার্য পরিকল্পনায় ফটোকপির পাঁচটি যন্ত্র সচল থাকার পরও ছয় লাখ ৩০ হাজার টাকা খরচ করা হয়; হেলথ এডুকেশন অ্যান্ড প্রমোশনে ৩৭ লাখ ২০ হাজার টাকা খরচ দেখানো হয়েছে পোস্টার ছাপাতে, এবং এর জন্য কোনো দরপত্র চাওয়া হয় নি এবং ক্রয়বিধি মানা হয় নি; উপস্থিতির হিসাব রাখতে ১২২টি যন্ত্র ৩৩ লাখ ৭০ হাজার ৮০০ টাকায় ক্রয় করা হয় যা ব্যবহার করা হচ্ছে না; দেশের বাইরে প্রশিক্ষণে ১৪ জনের অংশগ্রহণের খরচ দেখানো হলেও বিদেশে গিয়েছেন ১২ জন এবং এবং দু'জনের খরচ বাবদ দেখানো হয়েছে ১০ লাখ ৫১ হাজার ৭৩০ টাকা।[৭৩] এর কারণ হিসেবে জানা যায়, কর্মসূচিতে কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। যার প্রেক্ষিতে অর্থের অপচয় হচ্ছে এবং মানুষ স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

---

[৭২] *দৈনিক প্রথম আলো*, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩।

[৭৩] *প্রাগুক্ত*।

নিরীক্ষা প্রতিবেদন সম্পর্কে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, স্বাস্থ্যখাতে ১৯৯৫-১৯৯৮ সময় পর্যন্ত উত্থাপিত অডিট আপত্তিসমূহের সবগুলো নিষ্পত্তি করা হলেও এর পরবর্তীতে উত্থাপিত অডিট আপত্তিসমূহের সবগুলো নিষ্পত্তি করা হয় নি। উল্লেখ্য, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী দেখা যায়, ২০১২-১৩ অর্থ-বছরে মোট পুঞ্জিভূত অডিট আপত্তির সংখ্যা ১১,১৭৯টি, জড়িত টাকার পরিমাণ ২,৭৪৩.১২ কোটি। নিষ্পত্তির সংখ্যা ১০০৪টি এবং জড়িত টাকার পরিমাণ ১৬৬.১৪ কোটি টাকা।

২.৫ উপসংহার

এ অধ্যায়ের আলোচনা হতে দেখা যাচ্ছে, স্বাস্থ্য খাতের সার্বিক দায়িত্বে রয়েছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। এর অধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে যা কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে রয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। এছাড়া স্বাস্থ্যখাতের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনায় আর্থিক ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। স্বাস্থ্যখাতে জাতীয় বাজেট বরাদ্দ টাকার অংকে বাড়লেও শতাংশের হারে ক্রমান্বয়ে কমছে। অন্যদিকে স্বাস্থ্য খাতে জিডিপি'র হারও ক্রমান্বয়ে কমছে। স্বাস্থ্যখাতে জাতীয় বাজেটের ব্যয় পর্যালোচনায় দেখা যায়, প্রতি অর্থ-বছরে উন্নয়ন খাতে অপেক্ষাকৃত বেশি ব্যয় করা হয়। স্বাস্থ্যখাতের বাজেট বরাদ্দে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু দেখা যায়, বিগত তিনটি কর্মসূচিতে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার অবদান ক্রমান্বয়ে কমছে। সকলের জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ধীন নিয়ন্ত্রকসংস্থাগুলোও স্বাস্থ্য খাতের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম

৩.১ ভূমিকা

কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তৃত সকল সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের প্রধান সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান হচ্ছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর এবং কমিউনিটি ক্লিনিক। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীন জাতীয়, বিভাগীয়, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন পর্যায়ের স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে চিকিৎসাসেবা কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন পরিচালক, বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য), পরিচালক (হাসপাতাল), অধ্যক্ষ, সিভিল সার্জন, তত্ত্বাবধায়ক, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, সেবা তত্ত্বাবধায়ক। এছাড়াও চিকিৎসাসেবা কার্যক্রমের সাথে আরও যারা জড়িত তাদের মধ্যে রয়েছে সহকারী সার্জন/ মেডিকেল কর্মকর্তা, কনসালটেন্ট, অধ্যাপক মর্যাদার চিকিৎসক, আবাসিক মেডিকেল কর্মকর্তা (আরএমও), সাব-অ্যাসিসটেন্ট কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার, কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার, স্বাস্থ্য পরিদর্শক, স্বাস্থ্য সহকারী, নার্সিং সুপারভাইজার, স্টাফ নার্স, মেডিকেল টেকনোলোজিস্ট ও এমএলএসএস। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা কার্যক্রম সম্পাদনে এ জনবলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।[৭৪]

এ অধ্যায়ে স্বাস্থ্য খাতে চিকিৎসা কার্যক্রম সম্পাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন বিষয় যেমন জনবল, নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতির প্রক্রিয়া, সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

৩.২ সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের জনবল ব্যবস্থাপনা

বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক ও চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম পরিচালনায় স্বাস্থ্যখাতে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদে নিয়োগ দেওয়া হয়।

৩.২.১ নিয়োগ

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা নিয়োগ প্রক্রিয়া

প্রথম শ্রেণীর জনবলের মধ্যে রয়েছে মহা-পরিচালক, অতিরিক্ত মহা-পরিচালক, পরিচালক, উপ-পরিচালক, সহকারী পরিচালক, অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ , উপ-পরিচালক, প্রোগ্রামার, সহকারী পরিচালক, সিভিল সার্জন, ডেপুটি সিভিল সার্জন, ইউএইচএফপিও, সহকারী সার্জন, রেজিস্টার, সেবা-তত্ত্বাবধায়ক, স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তা, সমাজ কল্যাণ কর্মকর্তা, পরিসংখ্যানবিদ প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ। শিক্ষকতা ও সেবা পর্যায়ে চিকিৎসকদের মধ্যে রয়েছে অধ্যাপক, সহযোগী ও সহকারী অধ্যাপক, সিনিয়র ও জুনিয়র কনসালটেন্ট, সহকারী সার্জন/মেডিকেল কর্মকর্তা, আবাসিক মেডিকেল কর্মকর্তা (আরএমও), আবাসিক ফিজিসিয়ান কর্মকর্তা (আরপিও), সহকারী রেজিস্টার, প্যাথলজিস্ট, অ্যানেসথেটিস্ট, রেডিওলোজিস্ট।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মর্যাদায় রয়েছে উপ-সেবা তত্ত্বাবধায়ক, নার্সিং সুপারভাইজার, ডেপুটি নার্সিং সুপারভাইজার, কম্পিউটার অপারেটর, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, হিসাব-রক্ষণ কর্মকর্তা, গণসংযোগ কর্মকর্তা, পুষ্টিবিজ্ঞানী প্রভৃতি। নিম্নে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা নিয়োগের প্রক্রিয়া আলোচনা করা হল।

ক) সরাসরি নিয়োগঃ বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের অধীন পরিচালিত বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বিসিএস) পরীক্ষার মাধ্যমে স্বাস্থ্যখাতে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর শূন্যপদে নিয়োগ দেওয়া হয়।[৭৫] প্রথম শ্রেণীতে চিকিৎসকদের সহকারী সার্জন ও সহকারী ডেন্টাল সার্জন হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। চিকিৎসক ছাড়াও বায়ো-কেমিস্ট, সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মকর্তা, গবেষণা কর্মকর্তা, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। এছাড়া প্রথম শ্রেণীর পদে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান অ্যাডহক ভিত্তিতে চিকিৎসক এবং প্রকল্পভুক্ত কর্মকর্তাদের সরাসরি নিয়োগ দিয়ে থাকে, যা সরকারি কর্ম কমিশনের অধীনে সম্পাদিত হয় না।

খ) বিসিএস নন-ক্যাডার নিয়োগঃ পদের স্বল্পতার কারণে বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সব প্রার্থীকে স্থায়ী শূন্যপদের বিপরীতে ক্যাডার পদে সুপারিশ করা হয় না, তবে তাদের নন-ক্যাডার পদে পর্যায়ক্রমে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।[৭৬]

---

[৭৪] স্বাস্থ্যখাতে সরকারি বিভিন্ন পর্যায়ের হাসপাতাল প্রধানদের বিস্তারিত পরিশিষ্ট ৪-এ দেওয়া হল।

[৭৫] www.pbsc.gov.bd

[৭৬] 'নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা-২০১০' অনুযায়ী।

গ) অ্যাডহক ভিত্তিতে নিয়োগ: স্বাস্থ্যখাতে শূন্যপদ পূরণে সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে রাজস্ব খাতে অ্যাডহক ভিত্তিতে চিকিৎসক নিয়োগ দেওয়া হয়। নিয়োগপ্রাপ্ত এসব চিকিৎসককে পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকরি কর্ম কমিশনের মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে তাদের চাকরি নিয়মিত করা হয়। নিয়মিতকরণ না হওয়া পর্যন্ত অ্যাডহক ভিত্তিতে নিয়োগকৃত চিকিৎসকরা বেতন-ভাতা পেলেও পদোন্নতি পান না। এই নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগ কমিটি গঠন[৭৭] করে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা[৭৮] নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে কোটা, বয়সসহ চাকরির অন্যান্য শর্তাবলী সরকারি চাকরির মতো একই রকম থাকে।[৭৯]

তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ প্রক্রিয়া

তৃতীয় শ্রেণীর পদে রয়েছে প্রধান সহকারী কাম হিসাবরক্ষক, ক্যাশিয়ার, স্টোর কিপার, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, ওয়ার্ড মাস্টার, ড্রাইভার, সহকারী নার্স, ডায়েটিশিয়ান, মেডিকেল টেকনোলজিস্ট, স্বাস্থ্য সহকারী, স্বাস্থ্য পরিদর্শক প্রভৃতি পদাধিকারী। চতুর্থ শ্রেণীর পদে রয়েছে এমএলএসএস, কুক/মশালচী, সুইপার, ওয়ার্ডবয়, ক্যাশ সরকার, জুনিয়র মেকানিক, কার্পেন্টার, জমাদ্দার, আয়া, দারোয়ান, মালী, ডোম প্রভৃতি পদাধিকারী। সিভিল সার্জন দপ্তর ও তার অধীনস্থ দপ্তরসমূহে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র মোতাবেক স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে জেলা পরীক্ষা পরিচালনা কমিটির মাধ্যমে প্রতি জেলায় লিখিত পরীক্ষা এবং বিভাগীয় পরীক্ষা পরিচালনা কমিটির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিভাগে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।[৮০] তবে চতুর্থ শ্রেণীর পদে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, পদের প্রকৃতি বিবেচনাক্রমে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা বা না করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।[৮১] মেডিকেল কলেজ পর্যায়ে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র মোতাবেক সরাসরি সংশ্লিষ্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়, এবং লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ দেয়।

৩.২.২ বদলি

মাঠ পর্যায়ে কর্মরত চিকিৎসকদের জন্য প্রতি কর্মস্থলে চাকরিকাল তিন বছর এবং দুর্গম ও পার্বত্য অঞ্চলের জন্য দুই বছর নির্ধারণ করা হয়েছে।[৮২] তবে পদোন্নতি, বিদেশে প্রশিক্ষণ এবং জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ পদে পদায়ন ছাড়া অন্য কোনো কারণে উক্ত সময়ের পূর্বে বদলি করতে হলে বিষয়টি একজন মন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটিতে বিবেচিত হতে হবে। কেবলমাত্র এই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় তিন/দুই বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে কোনো কর্মকর্তাকে অন্যত্র বদলি করতে পারবে।[৮৩] তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের বদলির কোনো বিধান নেই; শুধুমাত্র প্রশাসনিক প্রয়োজনে[৮৪] বদলি করার বিধান রয়েছে।[৮৫]

৩.২.৩ পদোন্নতি

স্বাস্থ্য ক্যাডার পদে নিয়োগকৃত কর্মকর্তাদের ডিপার্টমেন্টাল প্রমোশন কমিটি (ডিপিসি) এবং সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ডের (এসএসবি) মাধ্যমে ভিত্তিপদে সিলেকশন গ্রেড, উচ্চতর টাইমস্কেল এবং পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়। ক্যাডার পদে চাকরি স্থায়ী হওয়ার পর এবং চারবছর চাকরি করার পর সিনিয়র স্কেল পেতে সিনিয়র স্কেল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়।[৮৬] প্রশাসনিক পর্যায়ে চাকরির অভিজ্ঞতা চারবছর পূর্ণ হওয়ার পর সিলেকশন গ্রেড পাওয়ার জন্য বিবেচিত হয়। শিক্ষকতা এবং সেবা পর্যায়ে অন্যান্য

---

[৭৭] ২০১০ সালের ৪ এপ্রিল হতে অ্যাডহক ভিত্তিতে ৪ হাজার ১৩৩টি শূন্যপদে লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৯ হাজার প্রার্থীর সকলেই মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় মহাখালীর নিপসম ও জনস্বাস্থ্য ইন্সটিটিউটে। বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে মোট ৯টি বোর্ড গঠন করা হয়। প্রতিটি বোর্ডে মোট পাঁচজন করে (এদের মধ্যে ১জন মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ২ জন উপ-সচিব, ১ জন সংস্থাপন ও ১ জন অর্থ মন্ত্রণালয়ের) প্রতিনিধি থাকেন। প্রতিটি বোর্ডের সদস্য সচিব স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের একজন করে উপ-সচিব। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব অ্যাডহক নিয়োগ কমিটির সভাপতি এবং তিনি সার্বিক নিয়োগ পরীক্ষা ও নিয়োগ সংক্রান্ত সামগ্রিক কার্যক্রম তদারকি করেন।

[৭৮] ১০০ নম্বরের পরীক্ষায় (৮০ নম্বর লিখিত ও ২০ নম্বর মৌখিক) মেধাতালিকায় শীর্ষে অবস্থানকারী প্রার্থীদের চূড়ান্ত নিয়োগ প্রদান করা হয়।

[৭৯] এস. আর. ও. নং ৪৫-আইন/২০১০, ঢাকা, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১০/২ ফাল্গুন ১৪১৬, বাংলাদেশ গেজেট।

[৮০] বিস্তারিত: স্বারক নং-স্বাপকম/ প্রশা-১/২সি-০৭/২০০৮(অংশ-১)/৪৪৪।

[৮১] নং-০৫.০০.০০০০.১৭০.১৬.০১৬.১৩-২২৫; বিস্তারিত, www.mopa.gov.bd

[৮২] স্মারক নং-সম/এফএ-০৭/২০০৩-৩৭৬, তারিখ: ৬/১২/২০০৩।

[৮৩] মোহাম্মদ ফিরোজ মিয়া, সরকারি অনুমোদন প্রাপ্ত চাকরির বিধানাবলী, বর্ধিত ও সংশোধিত (পঞ্চাশতম সংস্করণ)।

[৮৪] সিভিল সার্জন সংশ্লিষ্ট জেলার এক উপজেলা থেকে অন্য উপজেলায় এবং বিভাগীয় পরিচালক সংশ্লিষ্ট বিভাগের এক জেলা থেকে অন্য জেলায় বদলি করতে পারবে।

[৮৫] বিচারপতি ছিদ্দিকুর রহমান মিয়া, চাকরির বিধিমালা (সর্বশেষ সংশোধনীসহ)। 'প্রশাসনিক প্রয়োজনে' বলতে প্রতিষ্ঠানে কোনো ধরনের অনিয়মের সাথে জড়িত থাকা, অনিয়মে জড়িত সাপেক্ষে অথবা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তেকে বোঝানো হয়েছে।

[৮৬] সিনিয়র স্কেল পরীক্ষা বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন পরিচালনা করে। পরীক্ষাটি পাঁচ মাসের ব্যবধানে বছরে দু'বার (ফেব্রুয়ারি এবং আগস্ট) অনুষ্ঠিত হয়। সিনিয়র স্কেল পদোন্নতিতে শিক্ষানবীশ হিসেবে দুই মাসের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন, বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (এসিআর) সন্তোষজনক এবং বিভাগীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়।

শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে চাকরির অভিজ্ঞতা ও প্রকাশনাকে মূল্যায়ন করা হয়।[৮৭] সহকারী অধ্যাপক থেকে সহযোগী অধ্যাপক এবং অধ্যাপক মর্যাদার পদোন্নতি পাবলিক সার্ভিস কমিশনের দ্বারা পরিচালিত হতো, কিন্তু পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে পদোন্নতি কার্যক্রম জটিল এবং দীর্ঘ প্রক্রিয়ায়[৮৮] (বছরে দু'বার অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে) বর্তমানে শিক্ষকদের ৮০% পদোন্নতি ডিপিসি[৮৯], এবং ২০% পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়।[৯০] অন্যদিকে উপ-সচিব থেকে যুগ্ম সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের এবং মেডিকেল কলেজের সহযোগী অধ্যাপক থেকে অধ্যাপক পদমর্যাদার এবং বিভাগীয় পরিচালক থেকে মহা-পরিচালক (ডিজি) পর্যায়ের কর্মকর্তাদের পদোন্নতি সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ড (এসএসবি) দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে।

৩.৩ জনবল ব্যবস্থাপনায় সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি

অর্গানোগ্রাম অনুসারে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মোট অনুমোদিত জনবল ৩৭৩। এর মধ্যে কর্মকর্তা ৯৬[৯১] এবং কর্মচারী ২৭৭।[৯২] স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্বে রয়েছেন একজন মন্ত্রী। তাকে সহায়তার জন্য রয়েছেন একজন প্রতিমন্ত্রী। মন্ত্রণালয়ের একজন সচিব রয়েছেন, যিনি মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় আওতাধীন বিভিন্ন অধিদপ্তর ও পরিদপ্তর তত্ত্বাবধান করে থাকেন। সচিবের পরেই রয়েছে অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম-সচিব/ যুগ্ম-প্রধান, উপ-সচিব/ উপ-প্রধান, সিনিয়র সহকারী সচিব/ সিনিয়র সহকারী প্রধান।[৯৩] স্বাস্থ্য অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অনুমোদিত মোট জনবল রয়েছে **১,১৫,৯৩৫** জন। এর মধ্যে কর্মকর্তা **৩৮,০৩১** জন এবং কর্মচারী **৭৭,৯০৪** জন।[৯৪]

নিচে স্বাস্থ্যখাতের চিকিৎসাসেবা সংক্রান্ত জনবল ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি আলোচনা করা হল।

৩.৩.১ জনবলের স্বল্পতা

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ডাক্তার, নার্স, চিকিৎসা সহকারী, স্বাস্থ্য সহকারী, মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ও অন্যান্য পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর প্রায় ২২ হাজারের অধিক পদ বর্তমানে শূন্য। বিভিন্ন পর্যায়ে জনবলের শূন্যতা যেমন রয়েছে, তেমনি বিদ্যমান জনবলের অনুপাতও আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী কম। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন পর্যায়ের হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে অনুমোদিত জনবলের (১,১৫,৯৩৫) বিপরীতে কর্মরত জনবল (৯৩,৩১৭) - শূন্য পদের হার ২০% (২২,৬১৮)। অনুমোদিত পদের

---

[৮৭] চাকরির অন্যান্য শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে শিক্ষকতা মর্যাদায় পদোন্নতির ক্ষেত্রে চাকরির সময়কাল, পোস্ট গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি এবং প্রকাশনাকে বিবেচনা করে পদোন্নতি প্রদান করা হয়। মেডিকেল অফিসার (গ্রেড-৯) থেকে সহকারী অধ্যাপক (গ্রেড-৫) পদে পদোন্নতিতে পোস্ট গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন, সহকারী অধ্যাপক থেকে সহযোগী অধ্যাপক (গ্রেড-৪) পদে পোস্ট গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন, তিন বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা ও তিনটি প্রকাশনা, সহযোগী অধ্যাপক থেকে অধ্যাপক পদে (গ্রেড-৩) পোস্ট গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন, পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা, এবং ৫টি প্রকাশনা থাকতে হবে। সেবা পর্যায়ে মেডিকেল অফিসার থেকে জুনিয়র কনসালটেন্ট (গ্রেড-৫) মর্যাদায় পোস্ট গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি, পাঁচ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা, জুনিয়র কনসালটেন্ট থেকে সিনিয়র কনসালটেন্ট (গ্রেড-৪) পদে পোস্ট গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি এবং চার বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা। মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনিক পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে অন্যান্য শর্তাবলী যেমন- চাকরির বয়স, বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ, সিনিয়র স্কেল ও বিভাগীয় পরীক্ষায় পাশ, জ্যেষ্ঠতা এবং বার্ষিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে পদোন্নতি প্রদান করা হয়। অন্যদিকে, সিলেকশন গ্রেডের মাধ্যমে মেডিকেল অফিসার (গ্রেড-৯) থেকে আর.এম.ও. (গ্রেড-৭) পদে পদায়নে চাকরির অন্যান্য শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে চাকরির অভিজ্ঞতায় কমপক্ষে চার বছর, আর.এম.ও. থেকে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার-পরিকল্পনা কর্মকর্তা (গ্রেড-৬) পদে চার বছর, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার-পরিকল্পনা কর্মকর্তা থেকে সিভিল সার্জন (গ্রেড-৫) পদে অভিজ্ঞতা চার বছর, সিভিল সার্জন হওয়ার পর দুই বছর চাকরির অভিজ্ঞতা থাকলে উপ-পরিচালক (গ্রেড-৪) হিসেবে এবং উপ-পরিচালক থেকে ২ বছর হলে পরিচালক হিসেবে, পরিচালক হিসেবে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে উপ-মহাপরিচালক পদে এবং উপ-মহাপরিচালক পদে ৩ বছরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মহা-পরিচালক পদে পদোন্নতির জন্য বিবেচ্য হন।

[৮৮] মন্ত্রণালয় থেকে রিকুইজিশন পাঠালে পদোন্নতির প্রক্রিয়া শুরু থেকে শেষ করতে প্রায় বছর খানেক সময় লাগে।

[৮৯] জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিধি ৫ শাখার ৬ এপ্রিল ২০১১ তারিখের প্রজ্ঞাপন মোতাবেক বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস রিক্রুটমেন্ট রুলস, ১৯৮১ বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের সাথে পরামর্শক্রমে সংশোধন এবং চিকিৎসকদের বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটি কর্তৃক পদোন্নতি কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

[৯০] ডিপিসির মাধ্যমে পোস্ট গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন ডাক্তারদের একটি দিক হচ্ছে জুনিয়র কনসালটেন্ট, সিনিয়র কনসালটেন্ট (সেবা পর্যায়); অন্যটি হচ্ছে সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক (একাডেমিক পর্যায়)। ডাক্তারদের পোস্ট গ্রাজুয়েশন না থাকলে প্রশাসনিক পর্যায়ে ডিপিসির মাধ্যমে মেডিকেল অফিসার থেকে রেসিডেন্সিয়াল মেডিকেল অফিসার (আরএমও), আরএমও থেকে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার-পরিকল্পনা কর্মকর্তা (ইউএইচপিও), এইচপিও থেকে ডেপুটি সিভিল সার্জন (ডিসিএস), ডিসিএস থেকে সিভিল সার্জন (সিএস), সিএস থেকে সহকারী পরিচালক (এডি) এবং উপ-পরিচালক (ডিডি)। ডিপিসি কমিটিতে মন্ত্রণালয়ের সচিব-চেয়ারম্যান, যুগ্ম সচিব-সদস্য সচিব, অন্যান্য সদস্য-অর্থ মন্ত্রণালয়ে একজন, আইন মন্ত্রণালয়ের একজন এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি থাকেন।

[৯১] সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম-সচিব/ যুগ্ম-প্রধান, উপ সচিব, উপ প্রধান, সচিবের একান্ত সচিব, সিনিয়র সহকারী সচিব, সিনিয়র সহকারী প্রধান, সিস্টেম এনালিস্ট, প্রোগ্রামার, মেইন্টেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার, সহকারী প্রোগ্রামার, সহকারী মেইন্টেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার, সিনিয়র কম্পিউটার অপারেটর, হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, গ্রন্থাগারিক; বিস্তারিত: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের অর্গানোগ্রাম।

[৯২] প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক, অফিস সহকারী/ উচ্চমান সহকারী, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, হিসাব রক্ষক, সহকারী হিসাব রক্ষক, ক্যাশিয়ার, অডিটর, পরিসংখ্যানবিদ, কম্পিউটার অপারেটর, নিম্নমান সহকারী, ক্যাশ সরকার, সাঁট লিপিকার, ডেসপাচ রাইডার, গাড়ি চালক, দপ্তরী, এমএলএসএস, সুইপার; বিস্তারিত: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের অর্গানোগ্রাম।

[৯৩] স্বাস্থ্যমন্ত্রণালয়ধীন জনবলের ক্রমাধিকার পরিশিষ্ট ৫-এ দেওয়া হল।

[৯৪] স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, *স্বাস্থ্য বুলেটিন* ২০১৩।

(৪৯০) বিপরীতে সবচেয়ে বেশি পদ শূন্য রয়েছে প্রথম শ্রেণীর নন-ডাক্তার মর্যাদাসম্পন্ন কর্মকর্তাদের যা ৫৬.০% (২৭৪)। এরপরেই রয়েছে প্রথম শ্রেণীর ডাক্তারদের (অনুমোদিত পদ ২২,১২০) যা ২৮.০% (৬,১৯৮)।[৯৫]

চিত্র ৩.১: স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীন বিভিন্ন শ্রেণীতে শূন্য জনবল (অনুমোদিত পদের বিপরীতে)

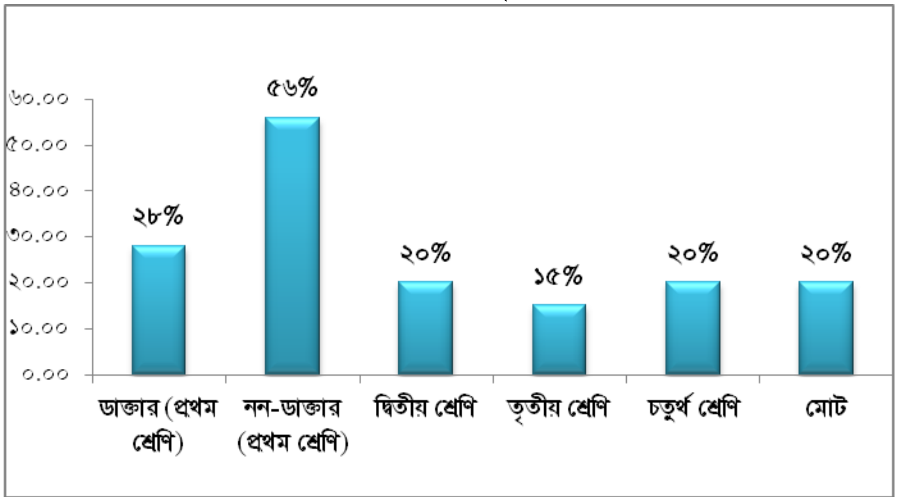

বাংলাদেশে ডাক্তার ও নার্সের অনুপাত ১:০.৪৮, যেখানে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অনুপাত ১:৩।[৯৬] বাংলাদেশে প্রতি ৩,২৯৭ জনের জন্য রয়েছে একজন ডাক্তার (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশ অনুযায়ী প্রতি ৬০০ জনের জন্যে ১ জন ডাক্তার) ও প্রতি ১১,৬৯৬ জনের জন্য রয়েছে একজন নার্স।[৯৭] তাছাড়া প্রতি ২,৩০৭ জনের জন্য রয়েছে একজন মাঠকর্মী ও প্যারামেডিক।[৯৮] বাংলাদেশে নার্স ও শয্যা সংখ্যার অনুপাত ১:১৩, যেখানে আন্তর্জাতিক মান অনুসারে প্রতি শিফটে সাধারণ শয্যায় নার্স ও রোগীর অনুপাত হওয়া উচিত ১:৪ এবং স্পেশালাইজড শয্যায় নার্স ও রোগীর অনুপাত ১:১।[৯৯]

প্রথম শ্রেণীর ডাক্তারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শূন্য পদ রয়েছে কনসালটেন্ট পদে - সিনিয়র কনসালটেন্ট পদে ৪৯% এবং জুনিয়র কনসালটেন্ট পদে ৪৮%। এরপরেই রয়েছে সহযোগী অধ্যাপক (৪২%), সহকারী অধ্যাপক (৪১%) এবং সহকারী সার্জন পদে (২৩%)। বিভাগ অনুযায়ী প্রথম শ্রেণীর ডাক্তারদের মধ্যে শূন্য পদের হার সবচেয়ে বেশি বরিশাল (৩৯%) ও খুলনা বিভাগে (৩৯%), এবং সবচেয়ে কম ঢাকা বিভাগে (১৬%)।[১০০]

সারণি ৩.১: ডাক্তারদের মধ্যে অনুমোদিত পদের বিপরীতে শূন্য জনবল

পদ	অনুমোদিত	বিদ্যমান	শূন্য	শূন্য পদের হার (%)
অধ্যাপক	৪৭০	২৭৫	১৯৫	৪১
সহযোগী অধ্যাপক	৬৮৬	৩৯৫	২৯১	৪২
সহকারী অধ্যাপক	৯৪৬	৭৭১	১৭৫	১৮
সিনিয়র কনসালটেন্ট	৪৩৯	২২৬	২১৩	৪৯
সিনিয়র লেকচারার	৮	৮	০	০
জুনিয়র লেকচারার	৩২	২৭	৫	১৬
জুনিয়র কনসালটেন্ট/ সমমান	৩৮২৯	১৯৭২	১৮৫৭	৪৮
সহকারী সার্জন/ সমমান	১৪৮০২	১১৪৩৩	৩৩৬৯	২৩

তথ্যসূত্র: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, *স্বাস্থ্য বুলেটিন* ২০১৩।

[৯৫] স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, *স্বাস্থ্য বুলেটিন* ২০১৩।

[৯৬] স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, *জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি* ২০১১, *সুস্বাস্থ্য উন্নয়নের হাতিয়ার*।

[৯৭] স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, *স্বাস্থ্য বুলেটিন* ২০১৩।

[৯৮] NewsAsia24.com (www.newsasia24.com), তারিখ: ১৫/০৭/২০১৩।

[৯৯] স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, সেবা পরিদপ্তর, *বার্ষিক প্রতিবেদন* (২০১২-২০১৩), ।

[১০০] স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, *স্বাস্থ্য বুলেটিন* ২০১৩।

মেডিকেল টেকনোলজিস্ট স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরাধীন মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের মোট অনুমোদিত পদের (৬,৪২৮) বিপরীতে শূন্য পদ ২১% (১,৩৩২)। মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পদ শূন্য রেডিওথেরাপিতে (৩৩%) এবং সবচেয়ে কমের মধ্যে রয়েছে রেডিওগ্রাফি (১১%) ও ডেন্টাল (৭%)। ডমিসিলিয়ারি স্টাফদের অনুমোদিত পদের বিপরীতে শূন্য পদ ৮.৯% (২,৩৫০)।[১০১] তৃতীয় পর্যায়ের একটি হাসপাতালে স্বাস্থ্য টেকনিশিয়ানের প্রয়োজন ১৫৫ হলেও সেখানে পদ রয়েছে ৮০টি (রেডিওলজি, প্যাথলজি, রেডিওথেরাপি, ফিজিওথেরাপি ও ডেন্টাল কেয়ার)।[১০২]

সারণি ৩.২: বিভিন্ন পর্যায়ে মেডিকেল টেকনোলজিস্ট পর্যায়ে শূন্য জনবল (%)

পদ	অনুমোদিত	বিদ্যমান	শূন্য	অনুমোদিত পদের বিপরীতে শূন্য পদ
ফার্মেসি	২,৯৩৪	২,১৭২	৭৬২	২৬%
ল্যাবরেটরি	১,৯৯০	১,৬১০	৩৮০	১৯%
রেডিওগ্রাফি	৭১৫	৬৩৪	৮১	১১%
রেডিওথেরাপি	৫৭	৩৮	১৯	৩৩%
ফিজিওথেরাপি	২০১	১৪৭	৫৪	২৭%
ডেন্টাল	৫৩১	৪৯৫	৩৬	৭%
মোট	৬,৪২৮	৫,০৯৬	১,৩৩২	২১%

তথ্যসূত্র: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, *স্বাস্থ্য বুলেটিন* ২০১৩।

চিকিৎসাসেবায় নার্সিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নার্সের বিভিন্ন শ্রেণির পদে শূন্য জনবলের হার সবচেয়ে বেশি দেখা যায় (সারণি ৩.৩)।

সারণি ৩.৩: নার্স পদমর্যাদায় বিভিন্ন শ্রেণিতে জনবল

পদ	অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য
প্রথম শ্রেণি	১৭৪	১	১৭৩ (৯৯.৪%)
দ্বিতীয় শ্রেণি	২১,০৫২	১২,৬০৯	৮,৪৪৩ (৪০.১%)
তৃতীয় শ্রেণি	১,৩৭৫	৬২৫	৭৫০ (৫৪.৫%)

তথ্যসূত্র: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, *স্বাস্থ্য বুলেটিন* ২০১৩।

৩.৩.২ নিয়োগে সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি

স্বাস্থ্যখাতে চিকিৎসা সংক্রান্ত নিয়োগে বিভিন্ন ধরনের সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি লক্ষ করা যায়।

৩.৩.২.১ জনবল নিয়োগে সীমাবদ্ধতা: স্বাস্থ্যখাতে জনবলের বিভিন্ন পদ শূন্য থাকার পেছনে রয়েছে দীর্ঘ নিয়োগ প্রক্রিয়া।

- **জনবলের অনুমোদন না দেওয়া:** জনবল নিয়োগের জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জনবলের চাহিদা নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পাঠায়। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় পুনরায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে জনবলের চাহিদা চূড়ান্ত করে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে পাঠায়। পরবর্তীতে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় এটি অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠায়। কিন্তু দেখা যায় চাহিদা সাপেক্ষে নতুন জনবলের অনুমোদন পেতে কখনো কখনো আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতায় জনবল নিয়োগে অনেক বেশি সময় লেগেছে বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনুমোদন পাওয়া যায় নি। উদাহরণস্বরূপ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জনবলের চাহিদা নির্ধারণ করে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে পাঠালেও দীর্ঘদিন পর্যন্ত তা অনুমোদিত হয় নি। পরবর্তীতে অনুমোদিত হলেও চাহিদার প্রেক্ষিতে অনেক কম অনুমোদন দেওয়া হয় (টিআইবি, ২০১৩)। অনুমোদিত পদগুলোতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মৃত্যু, অবসর, চাকরি ছেড়ে দেওয়া, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে নতুন পদ সৃষ্টিতে পুনরায় নিয়োগে দীর্ঘসূত্রতার কারণে পদ শূন্য থাকে।
- **জনবলের চাহিদা নির্ধারণে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা না থাকা:** স্বাস্থ্যখাতের চিকিৎসাসেবার মান উন্নয়নে বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক পর্যায়ে, সেবা পর্যায়ে এবং শিক্ষকতা পর্যায়ে প্রয়োজনীয়তা যাচাই সাপেক্ষে কোন কোন পদ পূরণ করতে হবে, পদ পূরণে কতজন লোক প্রয়োজন তার চাহিদা নির্ধারণে আবশ্যকতা যাচাই এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অভাব রয়েছে। এই কারণে

---

[১০১] *প্রাগুক্ত*।

[১০২] *দ্য ডেইলি স্টার*, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১১।

বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে রোগী ও শয্যা অনুপাতে ডাক্তার, নার্সসহ অন্যান্য পদে লোকবলের যেমন ঘাটতি রয়েছে, তেমনি নতুনভাবে জনবল নিয়োগের বিষয়ের দিকে নজর না দিয়েই হাসপাতালগুলোতে নতুন বিভাগ খোলা এবং শয্যা সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে টিআইবি'র রিপোর্ট কার্ড জরিপ (২০১১, ২০১২, ২০১৩) পর্যালোচনা করে দেখা যায়, জেলা, উপজেলা, এবং মেডিকেল কলেজ পর্যায়ের স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে শয্যা সংখ্যা বাড়ানো হলেও সে অনুপাতে জনবলের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় নি। ৮৮.৯% জেলা সিভিল সার্জন মনে করেন, হাসপাতালগুলোতে পর্যাপ্ত জনবল নেই। কারণ হিসেবে তারা জানান, একদিকে পদ সংখ্যা কম এবং অন্য দিকে ছুটিতে ও প্রেষণে থাকার জন্য জনবলের আরও ঘাটতি তৈরি হয়েছে।[১০৩]

- **রিটের কারণে শূন্য জনবল পূরণে বিলম্ব:** কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিয়োগে দলীয়করণ, অনিয়ম ও দুর্নীতি সংঘটিত হলে নিয়োগ প্রার্থীদের কেউ কেউ আদালতে রিট করেন এবং পরবর্তীতে নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিত করা হয়। সেক্ষেত্রে রিটের মামলাগুলো বছরের পর বছর অনিষ্পন্ন থাকে। ফলে শূন্য পদগুলো পূরণে বিলম্ব হয়। উদাহরণস্বরূপ, ২০০৯ সালে **১৭১** জন কর্মচারী নিয়োগে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দুর্নীতি ও অনিয়মের ঘটনা প্রকাশিত হলে নিয়োগ প্রার্থীরা একটি রিট আবেদন করলে নিয়োগ প্রক্রিয়াটি দীর্ঘদিন ঝুলে থাকায় (২০১৩ সালের ৭ অক্টোবর পর্যন্ত) শূন্য পদে কোনো কর্মচারী নিয়োগ করা সম্ভব হয় নি (টিআইবি, ২০১৩)। সেক্ষেত্রে রিট আবেদন সমাধান না হওয়া পর্যন্ত শূন্য পদগুলোতে জনবল পূরণে বিলম্ব হয়।

৩.৩.২.২ অ্যাডহক ভিত্তিতে চিকিৎসক নিয়োগে দুর্নীতি: সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে ২০১০ সালে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে ৪,১৩৩ জন অ্যাডহক চিকিৎসক (সহকারী সার্জন) নিয়োগ দেওয়া হয়।[১০৪] এই নিয়োগে সুপারিশ আসে মন্ত্রণালয় পর্যায়ের কর্মকর্তা ও স্বাচিপ পর্যায়ের নেতাদের কাছ থেকে। তবে রাজনৈতিক তদবিরের পাশাপাশি এ ধরনের নিয়োগ পেতে ঘুষের লেনদেন হয় যার পরিমাণ তিন লক্ষ থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা।[১০৫]

৩.৩.২.৩ কর্মচারী নিয়োগে দুর্নীতি: বিভিন্ন পর্যায়ের স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগে প্রভাবশালীদের কাছ থেকে সুপারিশ আসে এবং এ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরে চাকরি প্রার্থীদের এক লক্ষ থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঘুষ দিতে হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। এ ধরনের অর্থ আদায়ের সাথে স্থানীয় পর্যায়ের দলীয় নেতা, হাসপাতালের কর্মচারী ইউনিয়ন নেতা, প্রধান সহকারী, হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, অধিদপ্তরের প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং দলীয় নেতার ব্যক্তিগত সহকারী সম্পৃক্ত বলে জানা যায়। উদাহরণস্বরূপ, উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রে উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসারের (সেকমো) মোট ৭২৯টি পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। নিয়োগপ্রাপ্তরা **১৬** মার্চ **২০১৪** তারিখ থেকে যোগদান করেন।[১০৬] নিয়োগ পাওয়া ব্যক্তি এবং অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট থেকে জানা যায়, নিয়োগ পেতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিন লাখ টাকা থেকে চার লাখ টাকা পর্যন্ত দিতে হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিয়োগের জন্য প্রদানকৃত টাকা ফেরত পায় নি।

জেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরাধীন সিভিল সার্জনের দপ্তর এবং অধীনস্থ দপ্তরসমূহে নয়টি জেলার জন্য[১০৭] তৃতীয় (৪০৪টি) ও চতুর্থ শ্রেণীর (**৩১৮**টি) শূন্য পদ পূরণে নিয়োগ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে ভুক্তভোগীরা হাইকোর্টে রিট করলে নিয়োগটি পুনরায় নিয়োগ দেওয়ার জন্য বলা হয়।[১০৮] এই নিয়োগে কোনো কোনো ক্ষেত্রে জনপ্রতি চার লাখ থেকে পাঁচ লাখ টাকা পর্যন্ত ঘুষ দিতে হয়েছিল।[১০৯]

মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলোতেও কর্মচারী নিয়োগে দুর্নীতি ও অনিয়ম সংগঠিত হয়। এ ধরনের নিয়োগে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নির্ধারিত পদের বিপরীতে অতিরিক্ত নিয়োগ দেওয়া হয়, অন্যদিকে নিয়োগ দেওয়ার আশ্বাসে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায় করা হয়। তৃতীয় পর্যায়ের একটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কর্মচারী নিয়োগে **১৭১** কর্মচারীর বিপরীতে ৩৫৪ জনকে নিয়োগ দেওয়ার চেষ্টা করা হয় এবং এক্ষেত্রে ঘুষের লেনদেন হয় যার পরিমাণ এক থেকে সাড়ে তিন লাখ টাকা। এ প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট অংশীজন হতে জানা

[১০৩] উবিনীগ আয়োজিত জাতীয় সেমিনার 'বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সেবা ও জনগণের প্রত্যাশা, স্বাস্থ্য আন্দোলন', ২৫ নভেম্বর ২০১৩।
[১০৪] বিস্তারিত জানতে দেখুন, www.mohfw.gov.bd (accessed on 20/06/2014).
[১০৫] নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ প্রতিবেদনের সারণি ৩.৪-এ দেওয়া হল।
[১০৬] স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রশাসনিক পর্যায়ের কর্মকর্তার প্রাপ্ত তথ্য মতে, তারিখ: ০৪/০৫/২০১৪।
[১০৭] নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, নঁওগা, নড়াইল, যশোর, সাতক্ষীরা, বরিশাল ও নোয়াখালী।
[১০৮] স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ২০ মার্চ, ২০১২ এর পরিপত্র মোতাবেক তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর শূন্য পদ পূরণে ২২ নভেম্বর, ২০১২ তারিখে একটি জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞপ্তি দেয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর (২৮ ধরনের পদের)। সবচেয়ে বেশি নিয়োগ দেয়া হয় স্বাস্থ্য সহকারী পদে এবং এমএলএসএস ও সুইপার পদে। দরখাস্তের বিপরীতে আবেদনপত্র জমা পড়ে এক লাখেরও বেশি। ৭৭ হাজার প্রার্থীকে পরীক্ষার জন্য ডাকা হয়। কিন্তু লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন ৬৬ হাজার প্রার্থী ২৬ এপ্রিল ২০১৩। নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে ওঠা অনিয়ম নিয়ে ভুক্তভোগীরা হাইকোর্টে রিট করলে ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ তারিখে তিন মাসের জন্য স্থগিত করেন হাইকোর্ট। ২০১৪ সালে রিটটি খারিজ হয় এবং পূর্বের নিয়োগটি বাতিল করে পুনরায় নিয়োগের জন্য বলা হয়।
[১০৯] বিস্তারিত জানতে দেখুন *দৈনিক সমকাল*, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪।

যায়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগে নিয়োগপ্রাপ্তদের ৮০-৯০% কে নিয়োগ পেতে ঘুষ দিতে হয়। আরও জানা যায়, হিসাব রক্ষণ এবং স্টোর-কিপার এদের নিয়োগে ঘুষের হার উচ্চ।

৩.৩.৩ জনবল পদায়ন সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি

স্বাস্থ্যখাতে পদায়নে বিভিন্ন ধরনের সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি লক্ষ করা যায়, যা নিচে আলোচিত হল।

৩.৩.৩.১ সিভিল সার্জন ও ডেপুটি সিভিল সার্জন পদে পদায়ন না থাকা: স্বাস্থ্যখাতে মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনিক পদে সব জেলায় ডেপুটি সিভিল সার্জন পদ নেই। তিনটি জেলায় সিভিল সার্জন পদে পদায়ন নেই। বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী শুধুমাত্র 'এ' শ্রেণীর[১১০] জেলাগুলোতে (২৬টি জেলায়) ডেপুটি সিভিল সার্জন পদ আছে। এর মধ্যে ছয়টি পদ শূন্য এবং একটি পদে ভারপ্রাপ্ত হিসেবে একজন ডেপুটি সিভিল সার্জন কর্মরত।[১১১] যেখানে ডেপুটি সিভিল সার্জন নেই সেখানে সিভিল সার্জনকে একাই তার নিজ কার্যালয়, জেলা সদর হাসপাতাল, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ওয়ার্ড ভিত্তিক কমিউনিটি ক্লিনিক কার্যক্রম তদারকি করতে হয়।[১১২]

৩.৩.৩.২ জেলা পর্যায়ের হাসপাতালে তত্ত্বাবধায়ক পদে পদায়ন না থাকা: জেলা পর্যায়ের হাসপাতালের জন্য তত্ত্বাবধায়ক পদ সৃষ্টি হলেও[১১৩] চারটি জেলা হাসপাতালে (ফেনী জেনারেল হাসপাতাল, পাবনা মানসিক হাসপাতাল, খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট মোহাম্মদ আলী হাসপাতাল- বগুড়া) এ পদে পদায়ন নেই।[১১৪]

৩.৩.৩.৩ ইউএইচএফপিও পদে পদায়ন না থাকা: উপজেলা পর্যায়ে ৪৮৩টি ইউএইচএপপিও পদ সৃষ্টি করা হলেও **১১**টি উপজেলায় এই পদে পদায়ন নেই। তবে এর মধ্যে **১০**টি উপজেলায় এই পদের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।[১১৫]

৩.৩.৩.৪ উচ্চ শিক্ষায় প্রশিক্ষণ পদায়ন: উচ্চ শিক্ষায় প্রশিক্ষণরত চিকিৎসকরা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাথে ওএসডি হিসেবে সংযুক্ত থাকে। সংশ্লিষ্ট অংশীজন হতে জানা যায়, পছন্দনীয় স্থানে (একাডেমিক প্রতিষ্ঠান- যেখানে পড়ালেখার পাশাপাশি রোগীর সাথে থেকে প্রশিক্ষণ নেওয়ার সুযোগ থাকে) প্রশিক্ষণ পদায়ন পেতে হলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ২০ থেকে ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত নিয়ম-বহির্ভূতভাবে আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। প্রশাসনিক কর্মকর্তা পর্যায়ে এ টাকা আদায় করা হয় ।

৩.৩.৪ বদলি সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি

সরকারি কর্মকর্তারা (চিকিৎসকসহ) প্রতি স্টেশনে তিনবছর এবং দুর্গম ও পার্বত্য অঞ্চলে দুইবছর থাকার পর অন্যত্র বদলির জন্য বিবেচ্য হবেন বলা হলেও নিয়মিত এই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটে। সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের কাছ থেকে জানা যায়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে কর্মকর্তারা কর্মস্থলে যোগদানই না করেই অন্যত্র বদলির জন্য তদবির করে।

তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের নিজ জেলা/উপজেলায় পদায়ন দেওয়া হয়। তাদের বদলির জন্য নির্দিষ্ট কোনো সময়সীমা নেই। এজন্য স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠাগুলোতে কর্মচারীরা দীর্ঘদিন একই জায়গায় অবস্থানের প্রেক্ষিতে তাদের মধ্যে একটি শক্তিশালী সংগঠন ও নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে। পরবর্তীতে হাসপাতালের নিয়োগ থেকে শুরু করে চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রেই তারা প্রভাব খাটায় এবং দুর্নীতি ও অনিয়মের সাথে জড়িত থেকে হাসপাতালের বিভিন্ন কার্যক্রমকে ব্যাহত করে।

---

[১১০] আট বা ততোধিক উপজেলা নিয়ে গঠিত জেলাকে 'এ' ক্যাটাগরির জেলা বলা হয়।

[১১১] স্বাস্থ্য অধিদপ্তর অফিস সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য, তারিখ: ০৪/০৫/২০১৪।

[১১২] তদারকি কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে প্রশাসনের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি এবং উপজেলা পর্যায়ের ছুটি, বেতন-ভাতা, স্কেল পরিবর্তন ইত্যাদি কার্যক্রমসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সেবা কার্যক্রম এবং মাঠ পর্যায়ের জনগণের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি। তাছাড়া জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পাদন, বিভাগীয় কনফারেন্স, ওয়ার্কশপ, মত-বিনিময় সভাতে উপস্থিত হওয়া, সরকারি কাজে হেড কোয়ার্টারে যাওয়া, ব্যক্তিগত ছুটিতে যাওয়া প্রভৃতি কার্যক্রম।

[১১৩] সরকার কর্তৃক স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের প্রতিটি ১০, ২০, ৩১, ৫০, ১০০, ১৫০, ২০০, ২৫০, ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের জন্য জনবলের Standard Setup, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, ২৩/১২/২০০৮।

[১১৪] যে কারণে সিভিল সার্জন সেখানকার পদাধিকার বলে তত্ত্বাবধায়ক। যেখানে ডেপুটি সিভিল সার্জন থাকেন, তাকে তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব দিয়ে সিভিল সার্জন অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারলেও যেখানে ডেপুটি সিভিল সার্জন পদে পদায়ন নেই, সেখানে জেলার কার্যক্রম সষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সিভিল সার্জনকে বেগ পেতে হয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর অফিস সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য, ৪/০৫/২০১৪।

[১১৫] মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগর, ময়মনসিংহের ত্রিশাল, কুষ্টিয়ার কুমারখালী, হবিগঞ্জের চুনারুঘাট, খাগড়াছড়ির দীঘিনালা, ঠাকুরগাঁও সদর, রাজশাহীর পবা, জামালপুরের মাদারগঞ্জ, নরসিংদীর পলাশ, খুলনার দীঘলিয়া। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর অফিস হতে প্রাপ্ত তথ্য, তারিখ: ০৪/০৬/২০১৪।

বদলির ক্ষেত্রে যেসব নিয়ামক মুখ্য ভূমিকা পালন করে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে দলীয় প্রভাব, ব্যক্তিগত সুবিধা ও অবৈধ অর্থ লেনদেন। বদলি/ পদায়নে দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণগুলো সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হল।

- **প্রাইভেট চেম্বার/ক্লিনিকে প্র্যাকটিসের সুবিধায় বদলি নেওয়া বা না নেওয়া:** কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত চেম্বার/ বেসরকারি ক্লিনিকে প্রাইভেট প্র্যাকটিসের সুবিধায় অনেকে বদলি না নিয়ে দীর্ঘদিন একই স্থানে অবস্থান করে।[১১৬] আবার কেউ কেউ প্রাইভেট প্র্যাকটিসের সুবিধা বদলি/পদায়নকৃত স্থানে না থাকায় অন্যত্র বদলি নিয়ে থাকেন। এ প্রসঙ্গে এক প্রতিবেদন হতে জানা যায়, সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালে চিকিৎসকেরা যোগ দিয়েই বদলির তদবির শুরু করেন। ২০১৩ সালে এক বছরেই সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতাল থেকে বদলি নিয়েছেন ১৩ জন। এ সম্পর্কে হাসপাতালের একজন চিকিৎসক জানান, সুনামগঞ্জে প্রাইভেট প্র্যাকটিসের সুযোগ ভালো না থাকায় এখানকার চিকিৎসকেরা থাকতে চান না।[১১৭]
- **দলীয় রাজনীতির প্রভাবে বদলি:** সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিকট থেকে জানা যায়, যখন যে সরকার ক্ষমতায় থাকে তাদের সমর্থিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্যদল সমর্থিত ব্যক্তিদেরকে ঢাকার বাইরে অন্যত্র বদলি করা হয়- এটা একটি নিয়ম হয়ে গেছে। এছাড়া বদলির ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করেন স্বাচিপ পর্যায়ের নেতারা। উদাহরণস্বরূপ, হাসপাতালে দুর্নীতি ও অনিয়ম হওয়ায় এর সত্যতা উদঘাটনে তদন্ত কমিটির প্রধান হিসেবে প্রতিবেদন দাখিল করায় পদায়নের মাত্র কয়েক মাসের মাথায় অন্যত্র বদলি করা হয়। এ প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট তথ্যদাতা জানান, হাসপাতালের কর্মচারীরা তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লিখিত দোষী ব্যক্তির পক্ষ নেয় এবং প্রতিবেদন দাখিলকারীর বিরুদ্ধে অপ্রপচার চালিয়ে হাসপাতালের পরিবেশ নষ্ট করার প্রচেষ্টা চালায়। তিনি আরও জানান, এই দুর্নীতির সাথে কর্মচারীও জড়িত ছিল। পরবর্তীতে এক পর্যায়ে দলীয় প্রভাব খাটিয়ে তাকে অন্যত্র বদলি করা হয়।
- **স্থানীয় পর্যায়ে দলীয় প্রভাব/হুমকিতে বদলি:** কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ের নেতাদের চাহিদা, যেমন মিথ্যা ইনজুরি সার্টিফিকেট দেওয়া, দলীয় ব্যক্তিদের ঠিকাদারি দেওয়া ইত্যাদি না পূরণ করা হলে হুমকি দিয়ে তা করতে বাধ্য করা হয়। এ ধরনের কার্যক্রম থেকে বিরত থাকতে চাইলে অনেকে বদলি নিয়ে থাকেন। যেমন, উপজেলা পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা জানান, উক্ত উপজেলায় তাকে পদায়ন দেওয়া হলেও পদায়নের মাত্র অল্প কয়েক মাসের মধ্যে স্থানীয় পর্যায়ের নেতার ছেলের হুমকির তিনি পুনরায় বদলির জন্য চেষ্টা করেন।
- **একাধিকবার বদলি বা গণ বদলির আদেশ:** সংশ্লিষ্ট অংশীজন জানান, অনেকক্ষেত্রে দলীয় সমর্থকদের সুবিধা দিতে চিকিৎসক ও কর্মকর্তাদের কাউকে কাউকে যেমন স্বল্প সময়ের মধ্যে একাধিকবার বদলি করা হয়, তেমনি উর্ধ্বতন কর্মকর্তার অবসর ছুটিতে যাওয়া বা নির্ধারিত পদের মেয়াদ উত্তীর্ণের সময়ে গণবদলি করার মতো ঘটনাও কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। ৮ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ১,৬৯৫ জন কর্মকর্তাকে, ১০ ডিসেম্বর ১৩ জন এবং ১১ ও ১২ ডিসেম্বর ১৮ জন কর্মকর্তাকে বদলি ও পদায়ন করা হয়।[১১৮] অন্যদিকে, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে দু'দিনে শতাধিক চিকিৎসক ও কর্মকর্তাকে গণবদলির আদেশ দেন বিদায়ী মহাপরিচালক।[১১৯] এ প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট অংশীজন হতে জানা যায়, এই ধরনের গণ বদলিগুলো করা হয় রাজনৈতিক বিবেচনায়। অর্থাৎ রাজনৈতিক বিবেচনায় তালিকা অনুযায়ী বদলি/ পদায়ন করা হয় বা দিতে বাধ্য করা হয়।

৩.৩.৪.১ অবৈধ অর্থের বিনিময়ে বদলি: স্বাস্থ্যখাতে অবৈধ অর্থের বিনিময়ে বদলির বিভিন্ন উদাহরণ দেখা যায়। এই নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের লেনদেন হয় চিকিৎসকদের সংগঠন (স্বাচিপ/ ড্যাব) পর্যায়ের নেতা, মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা পর্যায়ে, এবং অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী পর্যায়ে। বদলিতে বিভিন্ন পর্যায়ে অবৈধ অর্থ দেওয়ার চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হল।

- **প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের ঢাকায় বদলি/পদায়নের জন্য:** স্বাস্থ্য বিভাগে প্রশাসনিক পর্যায়ের (সিভিল সার্জন) কর্মকর্তাদের ঢাকা বা ঢাকার আশেপাশে (নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ) বদলি/পদায়নে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায় করা হয়েছে। এ পর্যায়ের বদলিতে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের লেনদেনের পরিমাণ পাঁচ লক্ষ থেকে দশ লক্ষ টাকা।
- **চিকিৎসকদের ঢাকায় বদলি/পদায়নের জন্য:** চিকিৎসকদের এক উপজেলা থেকে অন্য উপজেলা এবং উপজেলা থেকে সরাসরি ঢাকায় বদলি/পদায়ন নিতে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে হয়। একটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হতে ঢাকায় এবং জেলা পর্যায়ের সদর হাসপাতাল থেকে তৃতীয় পর্যায়ের হাসপাতালে বদলি নিতে এক লক্ষ থেকে দুই লক্ষ টাকা পর্যন্ত দিতে হয়।
- **এক উপজেলা থেকে অন্য উপজেলায় বদলি/পদায়নের জন্য:** অ্যাডহক এবং ক্যাডার নিয়োগপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের কাছ থেকে জানা যায়, দুর্গম এলাকা থেকে সদরে, এক উপজেলা থেকে অন্য উপজেলায়, এবং উপজেলা থেকে সদরে বদলিতে ১০ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে হয়।

[১১৬] টিআইবি আয়োজিত 'স্বাস্থ্যসেবায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়: জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অভিজ্ঞতাভিত্তিক পরামর্শ সভা', ৩ জুলাই ২০১৩।
[১১৭] *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪।
[১১৮] *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৫ ডিসেম্বর ২০১৩।
[১১৯] *দৈনিক সমকাল*, ৯ জানুয়ারি ২০০৮।

- **বদলি না করার জন্য:** কোনো কোনো ক্ষেত্রে একই স্থানে দীর্ঘদিন অবস্থানের উদ্দেশ্যেও নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ দিতে হয়, যার পরিমাণ তিন লক্ষ টাকা। সংশ্লিষ্ট একজন তথ্যদাতার মতে, ২০০৪-৫ সালে এর পরিমাণ ছিল আড়াই লক্ষ থেকে তিন লক্ষ টাকা। তবে যারা ওপরের পর্যায়ের ডাক্তার নেতা বা দলীয় সমর্থক তাদের টাকা দেওয়ার প্রয়োজন হয় না।
- **কর্মচারীদের বদলি:** বদলির জন্য নির্দিষ্ট সময় না থাকলেও অনেকক্ষেত্রে বদলি নিতে আগ্রহী প্রার্থীরা তদবিরের মাধ্যমে পছন্দমতো স্থানে বদলি নিয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে বদলি নিতে অর্থের লেনদেন হয়ে থাকে যা ৫০ হাজার থেকে দুই লক্ষ টাকা পর্যন্ত। এ অর্থ লেনদেন হয় সিভিল সার্জন অফিস ও অধিদপ্তর অফিস পর্যায়ে।

৩.৩.৫ পদোন্নতি সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি

স্বাস্থ্যখাতে পদোন্নতির ক্ষেত্রে ডিপার্টমেন্টাল প্রমোশন কমিটি (ডিপিসি) এবং সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ড (এসএসবি) এর মাধ্যমে পদোন্নতিতে দলীয় লবিং প্রাধান্য পায়। এর ফলে কোনো কোনো কর্মকর্তা স্বল্প সময়ে যেমন একাধিকবার পদোন্নতি পায়, তেমনি কেউ কেউ দীর্ঘদিন পদোন্নতি বঞ্চিত হয়। পদোন্নতিতে সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরনগুলো নিচে আলোচনা করা হল।

৩.৩.৫.১ সিলেকশন গ্রেড পেতে বিলম্ব: মেডিকেল অফিসার থেকে আরএমও পদে চাকরিতে চার বছর পূর্ণ হলে সিলেকশন গ্রেড পাওয়ার জন্য বিবেচ্য হলেও প্রশাসনিক পর্যায়ে (মেডিকেল অফিসার থেকে আরএমও) আট বছরের পূর্বে কেউ সিলেকশন গ্রেড পায় নি বলে সংশ্লিষ্ট অংশীজন হতে জানা যায় (দেখুন বক্স ২)।

বক্স ২: প্রশাসনিক পর্যায়ে সিলেকশন গ্রেড ও পদে পদোন্নতিতে দীর্ঘসূত্রতা
অন্যান্য সাধারণ শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে চাকরিতে চার বছর পূর্ণ হলে মেডিকেল অফিসার থেকে আরএমও পদে সিলেকশন গ্রেড পাওয়ার জন্য বিবেচিত হওয়ার কথা। কিন্তু স্বাস্থ্য বিভাগের প্রশাসনিক পর্যায়ে সিলেকশন গ্রেড পেতে আট বছর বা তারও অধিক সময় লাগে। অধিকন্তু, আরএমও থেকে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ও সিভিল সার্জন পদে পদোন্নতিতে দীর্ঘসূত্রতা বিদ্যমান। এ প্রসঙ্গে প্রশাসনিক পর্যায়ে কর্মরত সংশ্লিষ্ট একজন তথ্যদাতা জানান, **১৯৮২** সালে তিনি বিসিএস পাশ করে মেডিকেল অফিসার হিসেবে **৩১** অক্টোবর চাকরিতে যোগদান করেন। **১৯৯০** সালে তাঁর চাকরির আট বছর পূর্ণ হয়। অথচ আরএমও হিসেবে সিলেকশন গ্রেড পান **১৯৯৪** সালে (**১২** বছরে)। পরবর্তীতে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা পদটি (গ্রেড-৬) পান ২০০৬ সালের ৯ মার্চ (২৪ বছরে) এবং সিভিল সার্জন (গ্রেড-৫) পদটি পান ২০০৭ সালের **১০** মার্চ তারিখে এবং উপ-পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পান ২০১৪ সালে। অর্থাৎ চাকরির অভিজ্ঞতায় যেখানে **১২** বছরেই সিভিল সার্জন হওয়ার কথা, সেখানে তাঁর প্রায় ২৫ বছর সময় লাগে এবং উপ-পরিচালক হিসেবে পদটি পেতে সময় লাগে ৩২ বছর।
তথ্যসূত্র: সংশ্লিষ্ট খাতে কর্মরত একজন উপ-পরিচালক

৩.৩.৫.২ চলতি দায়িত্বের[১২০] পদ নিয়মিতকরণে বিলম্ব: চলতি দায়িত্বপ্রাপ্ত পদে কর্মকর্তা তার ওপরের পদের দায়িত্ব পালন করলেও গ্রেড এবং পদ কোনটিই যেমন পান না, তেমনি তা নিয়মিতকরণেও বিলম্ব হয়। বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস অনুযায়ী চলতি দায়িত্ব দেওয়ার ছয় মাসের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত পদে নিয়মিতকরণ করতে হবে। কিন্তু এটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে করা হয় না। এ প্রসঙ্গে একজন সিভিল সার্জন জানান, ২০০৭ সালে তিনি সিভিল সার্জন হিসেবে চলতি দায়িত্ব পেলেও তাকে নিয়মিতকরণ করা হয় **২০১১** সালে। আবার ২০১৪ সালে উপ-পরিচালক পদটি দেওয়া হয়, তা কখন নিয়মিতকরণ করা হবে তা তিনি জানেন না। এ প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট অংশীজন হতে জানা যায়, গড়ে সাত থেকে আট বছরও কেউ কেউ চলতি দায়িত্ব পদে থাকেন। আবার চলতি দায়িত্ব হিসেবে যে অভিজ্ঞতায় বেশি তাকে দেওয়ার কথা থাকলেও কিছু ক্ষেত্রে জুনিয়রকে অর্থাৎ সিরিয়ালে যে অনেক পরে রয়েছে তাকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়। শিক্ষকতা এবং প্রশাসনিক দুটো ক্ষেত্রেই এটি ঘটে থাকে। চলতি দায়িত্ব নিয়মিতকরণে বিলম্বের কারণ হিসেবে প্রশাসনিক আগ্রহ এবং অদক্ষতার কথা উল্লেখ করেন সংশ্লিষ্ট অংশীজনরা।

৩.৩.৫.৩ দলীয় বিবেচনায় পদোন্নতি: স্বাস্থ্যখাতে প্রশাসনিক, শিক্ষকতা ও সেবা পর্যায়ে ডিপিসি এবং এসএসবি'র মাধ্যমে পদোন্নতিতে যে সকল শর্তাবলীকে বিবেচনায় রেখে পদোন্নতি দেওয়ার কথা তা না করে দলীয় বিবেচনায় পদোন্নতি দেওয়া হয়। যে সকল শর্তাবলীকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিবেচনায় নেওয়া হয় না তার মধ্যে রয়েছে - সিনিয়র স্কেল পরীক্ষায় পাশ,[১২১] চাকরির

[১২০] চলতি দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে শূন্যপদ পূরণ করা হয়। চলতি দায়িত্বপ্রাপ্ত পদটি তাকেই প্রদানের জন্য বলা হয় যিনি জ্যেষ্ঠতা ও কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে পদোন্নতির যোগ্য। চলতি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারী উক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত পদে স্থায়ী পদধারীর মর্যাদা দাবি করতে পারবে না। (২৭/০৫/৮৯ ইং তারিখের এসএসবি'র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে নির্দেশনা জারি করা হয়)।

[১২১] সিনিয়র স্কেল পরীক্ষায় পাশ প্রিভিলেজ **১**, সিনিয়র স্কেল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ প্রিভিলেজ ২, সিনিয়র স্কেল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করলে প্রিভিলেজ ৩। অনেকে যেমন সিনিয়র স্কেল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেনি, আবার সিনিয়র স্কেল পরীক্ষায় শুধুমাত্র অবতীর্ণ হয়েছেন।

অভিজ্ঞতা ও জ্যেষ্ঠতা,[১২২] বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ, উচ্চতর ডিগ্রি, প্রকাশনা ও বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (এসিআর)। দলীয় সমর্থক না হওয়ায় দীর্ঘদিন পদোন্নতি বঞ্চিত থাকতেও দেখা যায়। একজন তথ্যদাতা জানান, দলীয় সমর্থক না হওয়ায় দশ বছর পূর্বে গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন একজন ডাক্তার সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি না পেলেও একই বিষয়ে পোস্ট গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন ডাক্তার দু'বছরের মধ্যেই সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পান।

৩.৩.৫.৪ পদোন্নতিতে অর্থের লেনদেন: ডিপিসি'র মাধ্যমে পদোন্নতির ক্ষেত্রে অবৈধভাবে অর্থ আদায় করা হয়। এই অর্থের পরিমাণ নির্ভর করে পদবি, পদবির সংখ্যা এবং কোন বিষয়ের ওপর পদোন্নতি দেওয়া হবে তার ওপর। এ প্রসঙ্গে স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তা হতে জানা যায়, যদি অর্থ না দেওয়া হয় তবে ডিপিসি এবং এসএসবি কমিটিতে পদোন্নতির জন্য বিবেচিত ব্যক্তির নাম পাঠানো হয় না।

সারণি ৩.৪: স্বাস্থ্যখাতে জনবল ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন খাতে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ের পরিমাণ

অর্থ আদায়ের খাত	নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ (টাকা)
নিয়োগ	
অ্যাডহক চিকিৎসক	৩-৫ লক্ষ
তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী	১-৫লক্ষ
বদলি	
প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের ঢাকা এবং ঢাকার পার্শ্ববর্তী জেলায়	৫-১০ লক্ষ
চিকিৎসকদের উপজেলা এবং সদর থেকে ঢাকায় বদলি/ পদায়ন	১-২ লক্ষ
দুর্গম এলাকা থেকে সদরে, এক উপজেলা থেকে অন্য উপজেলা, এবং উপজেলা থেকে সদরে বদলি/ পদায়ন	১০ হাজার-৫০ হাজার
চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী	৫০ হাজার-২ লক্ষ
সুবিধামাফিক স্টেশনে দীর্ঘদিন অবস্থানের জন্য	২.৫ লক্ষ বা তার ওপরে
পদোন্নতি	
ডিপিসির মাধ্যমে ডাক্তারদের পদোন্নতি	৫-১০ লক্ষ

৩.৩.৬ চাকরিকালীন প্রশিক্ষণের সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি

স্বাস্থ্যখাতে প্রশিক্ষণ দুই ধরনের - ১) ক্লিনিক্যাল ও ২) নন-ক্লিনিক্যাল। ক্লিনিক্যাল প্রশিক্ষণের মধ্যে রয়েছে চিকিৎসা সংক্রান্ত (কার্ডিয়াক, অ্যাজমা, কিডনি, সিটি, এমআরআই প্রভৃতি) এবং নন-ক্লিনিক্যাল প্রশিক্ষণের মধ্যে রয়েছে প্রশাসনিক, অর্থ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বেসিক সার্ভিস ম্যানেজমেন্ট, ইংরেজি ভাষা, কম্পিউটার ইত্যাদি। এসব প্রশিক্ষণের ৯১% স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নের জন্য এবং ৯% স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে শক্তিশালীকরণের জন্য।[১২৩]

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালকের (প্রশাসন) নেতৃত্বে অধিদপ্তরের পরিচালকদের মধ্য হতে নয়জন প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত একটি কমিটি রয়েছে। এ কমিটি প্রতিটি ওপি থেকে প্রশিক্ষণার্থীদের তালিকা তৈরি করে মন্ত্রণালয়ে পাঠায়। পরবর্তীতে মন্ত্রণালয়ের সচিবের নেতৃত্বে অতিরিক্ত সচিব, উপ-সচিব এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সমন্বয়ে বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য সিলেকশন কমিটির মাধ্যমে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের নির্বাচন করা হয়। অন্যদিকে দেশের মধ্যে প্রশিক্ষণে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত চিকিৎসক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণে সংশ্লিষ্ট জেলা হতে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের নামের তালিকা চাওয়া হয় এবং সে অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ২০১২-১৩ অর্থবছরে মোট ১৩,৭৪,২৯৩ জন বিভিন্ন প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/ সেমিনার/ ওরিয়েন্টেশনে অংশগ্রহণ করে। এদের মধ্যে ৭,৬০,৫৭০ (৫৫%) দেশের ভেতরে, ১,৩৩৪ জন (০.১%) বিদেশে, এবং ৬,১২,৩৮৯ জন (৪৫%) কর্মশালা, সেমিনার ও ওরিয়েন্টেশনে অংশগ্রহণ করে, এবং এ খাতে ঐ বছর মোট ব্যয় হয় ২৫৮.৪০ কোটি টাকা - ১৮৬.১ কোটি টাকা (৭২%) প্রশিক্ষণে ও ৭২.২ কোটি টাকা (২৮%) ওয়ার্কশপ, সেমিনার এবং ওরিয়েন্টেশনে।

নিচে প্রশিক্ষণের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি আলোচনা করা হল।

---

[১২২] দলীয় বিবেচনায় প্রশাসনিক ক্যাডারেও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাকে সিভিল সার্জন পদে উন্নীত করা হয়, কিন্তু ডেপুটি সিভিল সার্জনকে সিভিল সার্জন পদে উন্নীত করা হয়নি, যদিও তিনি চাকরির অভিজ্ঞতায় জ্যেষ্ঠ। সংশ্লিষ্ট অংশীজন হতে জানা যায়, ২০০৭ সালে উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার-পরিকল্পনা কর্মকর্তা থেকে সিভিল সার্জন হন, যিনি চাকরির অভিজ্ঞতায় ঐ উপজেলার অন্তত দশজন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার-পরিকল্পনা কর্মকর্তা থেকে জুনিয়র ছিলেন। এরকম অবস্থা অন্যান্য জেলার ক্ষেত্রেও ঘটে থাকে বলে তিনি জানান।

[১২৩] স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, *স্বাস্থ্য বুলেটিন* ২০১৩।

৩.৩.৬.১ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ না হওয়া: স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ডাক্তারদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সটি বাধ্যতামূলক। ডাক্তারদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণ যেমন, দুই বছর শিক্ষানবীশ হিসেবে কাজ করা, বিভাগীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া, এবং শিক্ষানবীশ সন্তোষজনক সাপেক্ষে চাকরিতে স্থায়ী করা হবে বলা হলেও[১২৪] অনেকেই এই প্রশিক্ষণটি করেন নি। এ প্রসঙ্গে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ জানান, পূর্বে চাকুরি নিয়োগের তিন থেকে চার বছর পর প্রশিক্ষণটি করানো হতো এবং বিগত ছয় বছরে প্রায় ৩,৫০০ ডাক্তার এই প্রশিক্ষণটি করে নি। এর কারণ হিসেবে জানান, পূর্বে প্রশিক্ষণটির জন্য মাত্র দুটি প্রতিষ্ঠান (কুমিল্লা বার্ড এবং প্ল্যানিং অ্যাকাডেমি) ছিল। বর্তমানে এই প্রশিক্ষণটির ওপর অধিক গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে এবং প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি (ঢাকার বিয়াম ফাউন্ডেশন, বগুড়ার বিয়াম ফাউন্ডেশন, আইসিএমএইচ) করা হয়েছে।

৩.৩.৬.২ হাতে কলমে প্রশিক্ষণে পর্যাপ্ত সময় না থাকা: স্বাস্থ্যখাতের পেশাজীবী সংগঠনের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট অংশীজন জানান, প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে-কলমে শেখার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হলেও এ সময় তাদের দেওয়া হয় না। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, একজন কার্ডিওলজিস্টকে সাতদিন থেকে সর্বোচ্চ ১৫ দিনের মেয়াদে উচ্চ প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হয়। এই সময় স্বল্পতায় তার সার্জারি বিষয়ে পরিপূর্ণ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা সম্ভব না।

৩.৩.৬.৩ বিদেশে প্রশিক্ষণে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সুযোগ কম থাকা: প্রশিক্ষণ শাখায় কর্মরত সংশ্লিষ্ট অংশীজন হতে জানা যায়, বিদেশ প্রশিক্ষণে মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সুযোগ কম। অনেক কর্মকর্তা যেমন পাঁচ বছরে একবারও বিদেশে প্রশিক্ষণের সুযোগ পায় না, আবার অনেক কর্মকর্তা একাধিকবার বিদেশে প্রশিক্ষণের সুযোগ পাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রাক্তন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বলেন, মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বিদেশ প্রশিক্ষণে সুযোগ বেশি পায়; যদিও তারা সর্বদা স্বাস্থ্য ক্যাডারের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত নয়। তিনি আরও জানান, মন্ত্রণালয়ের ব্যক্তির সাথে যে চিকিৎসকের সম্পর্ক ভালো তিনিও বিদেশ প্রশিক্ষণের সুযোগ পান।

৩.৩.৬.৪ বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন না করা: বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচন করার কথা থাকলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্টতা নেই এমন ব্যক্তিকেও প্রশিক্ষণে জন্য নির্বাচন এবং প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এতে সকলের প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন।

৩.৩.৬.৫ প্রশিক্ষণের অনুমতির ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের দীর্ঘসূত্রতা: কোনো ডাক্তার কোনো একটি বিশেষ বিষয়ে দেশের বাইরে প্রশিক্ষণ গ্রহণে অংশগ্রহণে অনুমতির জন্য মন্ত্রণালয়ে আবেদন করলে নির্ধারিত সময়ে তিনি ছুটি পান না। যখন ছুটির অনুমতি দেওয়া হয়, তখন ঐ প্রশিক্ষণের সময় শেষ হয়ে যায় এবং ডাক্তার উক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় (টিআইবি, ২০১৩)। এ প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট তথ্যদাতা বলেন, পদক্ষেপ গ্রহণে সদিচ্ছার অভাবে দীর্ঘসূত্রতার সৃষ্টি হয়।

৩.৩.৬.৬ একাধিকবার প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ: অনেক কর্মকর্তা ও চিকিৎসক একই প্রশিক্ষণে একাধিকবার অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। এতে একদিকে যেমন একজন বেশি সুযোগ পাচ্ছেন, আরেকজন পাচ্ছেন না। অন্যদিকে যিনি সুযোগ বেশি পাচ্ছেন তিনি আর্থিকভাবে লাভবান হলেও অন্যেরা শেখা থেকে বঞ্চিত হন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, উপজেলা পর্যায়ে আইএমসিএইচ[১২৫]-এর ওপর সাত থেকে দশ দিনের একটি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, যেখানে একটি উপজেলায় কর্মরত একজন মেডিকেল কর্মকর্তা পর পর তিনবার অংশগ্রহণ করে। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ ভাতা হিসেবে প্রতিদিন তিনি এক হাজার টাকা করে সাতদিনে সাত হাজার টাকা, ও তিনবার প্রশিক্ষণে মোট ২১ হাজার টাকা পান। অন্যদিকে একই বিষয়ের ওপর বিভিন্ন এলাকায় অনুষ্ঠিত কর্মশালায় একই ব্যক্তির অংশগ্রহণেরও উদাহরণ রয়েছে, যার ফলে তিনি দুই জায়গা থেকে আর্থিকভাবে লাভবান হন।[১২৬]

৩.৩.৭ উচ্চতর প্রশিক্ষণে সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি

বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) এবং বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ান অ্যান্ড সার্জারি (বিসিপিএস) - এই দুইটি প্রতিষ্ঠান চিকিৎসায় স্নাতকোত্তর (পোস্ট গ্রাজুয়েশন) ডিগ্রি দিয়ে থাকে। বিএসএমএমইউ থেকে এমএস, এমডি, এমফিল, ও ডিপ্লোমা (ডিজিও, ডিএলও, ডিও) সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।[১২৭] এফসিপিএস ও এমসিপিএস সার্টিফিকেট দেওয়া

---

[১২৪] বিস্তারিত, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, নব-নিয়োগ শাখা, প্রজ্ঞাপন (নম্বর-সম/ননি-০১/২০০৬-১০১), তারিখ: ৩১ জুলাই ২০০৬। www.dghs.gov.bd।

[১২৫] Integrated Maternity and Child Health.

[১২৬] *দৈনিক প্রথম আলো*, ২ নভেম্বর ২০১৩।

[১২৭] প্রতিষ্ঠানভিত্তিক সার্টিফিকেট নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিদিনের ক্লাশ ও প্রশিক্ষণ লগবুক দেখে অধ্যাপক স্বাক্ষর করেন এবং সার্টিফিকেট দিয়ে থাকেন। চূড়ান্ত সার্টিফিকেট পরীক্ষার ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষা (তিন পেপার); প্র্যাকটিক্যাল ২দিন (বেড সাইড এবং টেবিল); থিসিস ডিফেন্স এই তিনটি পরীক্ষায় পাশ করলে বিশেষজ্ঞ হিসেবে স্বীকৃতি পান।

হয় বিসিপিএস থেকে। পূর্বে এই বিষয়গুলো বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সংযুক্ত ছিল। বিএসএমএমইউ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর স্নাতকোত্তর ডিগ্রিগুলো এটির সাথে সংযুক্ত করা হয়। এই বিষয়গুলোর ভর্তি পরীক্ষা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করে থাকে এবং মেধা অনুসারে প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন করে থাকে। বিশেষজ্ঞ ডিগ্রি গ্রহণে বিএসএমএমইউ-এর তত্ত্বাবধানে মোট ৩৩টি (সরকারি ২৩টি, বেসরকারি ১০টি) স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান রয়েছে।[১২৮]

নিচে উচ্চতর প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি নিয়ে আলোচনা করা হল।

৩.৩.৭.১ উচ্চশিক্ষায় প্রশিক্ষণ থাকাকালীন বেসরকারি চিকিৎসা চর্চা: সংশ্লিষ্ট অংশীজন জানান, উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য চাকরি থেকে প্রেষণে থাকার সময় প্রাইভেট প্র্যাকটিস করা থেকে বিরত থাকার কথা বলা[১২৯] হলেও এর ব্যত্যয় ঘটে। এ ব্যাপারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ জানান, উচ্চশিক্ষায় প্রশিক্ষণ থাকাকালীন অধিকাংশই বেসরকারি চিকিৎসা চর্চা করে থাকেন। এক্ষেত্রে তারা প্রশিক্ষণের রোস্টার এর সাথে মিল রেখে সময়-সূচি নির্ধারণ করেন।

৩.৩.৭.২ চাহিদার প্রেক্ষিতে বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের ঘাটতি: দেশে চাহিদার প্রেক্ষিতে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার তৈরিতে পোস্ট গ্রাজুয়েশন কোটার ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যতার ঘাটতি লক্ষ করা যায়। বিসিপিএস ২০১১-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দেশে অবসটেট্রিকস অ্যান্ড গাইনোকোলজিতে ৩৪৯ জন, মেডিসিনে ২২৭ জন, ও সার্জারিতে ১৩৪ জন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সিট থাকলেও অ্যানেসথেসিওলজিতে মাত্র ৪৫ জন যা প্রয়োজনের তুলনায় কম।[১৩০] চিকিৎসা সেবায় অ্যানেসথেটিস্ট সংকটের কারণে হাসপাতালগুলোতে রোগীদের অপেক্ষা করতে হয় এবং অপারেশন কক্ষগুলোরও পর্যাপ্ত ব্যবহার হয় না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অ্যানেসথেটিস্ট সংকটে অপারেশনের জন্য রোগীদের অনেকদিন অপেক্ষা করতে হয়। হাসপাতাল কতৃর্পক্ষের মতে, অ্যানেসথেটিস্ট সংকট নিরসন করা গেলে হাসপাতালে বর্তমানের চেয়ে দ্বিগুণ অপারেশন করানো সম্ভব (টিআইবি, ২০১৩)। ২০১২-১৩ সালে সিনিয়র কনসালটেন্ট পদমর্যাদায় বিষয়ভিত্তিক পদোন্নতিতেও (৩৫৬ জনের মধ্যে) দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি পদোন্নতি দেওয়া হয় সার্জারি (৫৭ জন), গাইনি (৫৩ জন) ও মেডিসিনে (৪৩ জন), যেখানে তুলনামূলকভাবে অ্যানেসথেসিয়া (১৬ জন), চর্ম ও যৌন (১৬ জন), রেডিওলজি (৬ জন), প্যাথলজি (৩ জন), বক্ষব্যধিতে (৩ জন) কম পদোন্নতি দেওয়া হয়।[১৩১]

সারণি ৩.৫: পোস্ট গ্রাজুয়েশন কোর্সে সিট সংখ্যা (ডিসেম্বর ২০১২)

প্রতিষ্ঠানের ধরন	এমএস	এমডি	এম.ফিল	ডিপ্লোমা	এমপিএইচ	এমটিএম	এমএমইডি	মোট
সরকারি (বিএসএমএমইউ)	১৪০	১৫০	৭০	১০৬	০	১০	০	৪৭৭
সরকারি	৩১২	৩৬০	২৪২	৪৭৮	১৮৫	০	১৫	১৬১৪
বেসরকারি	২১	৩৮	১৫	৯৫	০	০	০	১৬৯
মোট	৪৭৩	৫৪৮	৩২৭	৬৭৯	১৮৫	২১০	১৫	২২৭০

তথ্যসূত্র: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, *স্বাস্থ্য বুলেটিন* ২০১৩।

৩.৩.৭.৩ উচ্চতর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসকদের দক্ষতার উপযুক্ত ব্যবহারে দুর্বলতা: একজন ডাক্তার বিশেষজ্ঞ (জুনিয়র সার্জারি কনসালটেন্ট) হওয়ার পর তাকে পদায়ন দেওয়া হয় উপজেলায়। কিন্তু উপজেলা পর্যায়ে উপযুক্ত লজিস্টিকস ও সহায়ক জনবল না থাকার কারণে (যেমন- অ্যানেসথেটিস্ট না থাকা, অপারেশন থিয়েটার না থাকা) প্রশিক্ষণটি কাজে লাগানোর সুযোগ কম থাকে। ফলে বর্তমান প্রেক্ষাপটে তার দক্ষতার উপযুক্ত ব্যবহার হয় না।

৩.৩.৭.৪ প্রশিক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে না থাকা: উচ্চশিক্ষায় প্রশিক্ষণে যেখানে পদায়ন করা হয় সব প্রতিষ্ঠান/ হাসপাতালে সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা সব ক্ষেত্রে নেই। যেমন, সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজে মর্গ চালু করা হয় নি, অথচ সেখানে ফরেনসিক বিভাগ রয়েছে। এছাড়া সব হাসপাতালে এনজিওগ্রাম যন্ত্র নেই, অ্যানেসথেটিস্ট নেই।

৩.৪ তদারকি ও জবাবদিহি ব্যবস্থা

৩.৪.১ ডাক্তার-কর্মচারীদের উপস্থিতি কার্যক্রমে তদারকি ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা: ডাক্তারদের নির্দিষ্ট সময়ে হাসপাতালে উপস্থিত না হওয়া ও নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে হাসপাতাল ত্যাগ করলে তার জন্য কোনো জবাবদিহি করতে হয় না। অনেক ক্ষেত্রে হাসপাতাল

[১২৮] স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, *স্বাস্থ্য বুলেটিন* ২০১৩।
[১২৯] বিস্তারিত: নং-স্বাপকম/ চিশি-১/ শিক্ষানীতি-০৫/২০১২(অংশ-১)/৫৮০, তারিখ: ১৯/০৯/২০১৩।
[১৩০] স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, *স্বাস্থ্য বুলেটিন* ২০১৩।
[১৩১] স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১২-১৩)।

কর্তৃপক্ষ বারবার টেলিফোনে, লিখিতভাবে এবং সশরীরে উপস্থিত হয়ে অভিযোগ জানাবার পর মাত্র স্বল্প সংখ্যক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয় (টিআইবি, ২০১৩)। চিকিৎসকদের অধিকাংশের ক্ষেত্রে অভিযোগ আসে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির জন্য। এক প্রতিবেদন হতে জানা যায়, জানুয়ারি ২০১০ থেকে জুন ২০১৩ পর্যন্ত ৫৮৭ জন চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়, যার ৯০% অভিযোগ ছিল বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিতি সংক্রান্ত।[১৩২] এ প্রসঙ্গে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, চিকিৎসকদের জবাবদিহিতা নিশ্চিতে গণকর্মচারী শৃঙ্খলা (নিয়মিত উপস্থিতি) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ থাকলেও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কারণে তা বাস্তবায়ন করা কঠিন। এককভাবে স্বাস্থ্যখাতে শৃঙ্খলা আনা সম্ভব নয় বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

হাসপাতালের সেবার মান উন্নয়নে হাসপাতালের বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং ডাক্তারদের কর্মস্থলে উপস্থিতি নিশ্চিতকরণে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু দেখা যায়, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিয়মিত হয় না। সাম্প্রতিক সময়ে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা নিয়মিতকরণে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ৩০০ সংসদ সদস্যকে চিঠি দেয়।[১৩৩] হাসপাতালের বিভিন্ন সেবা কার্যক্রম এবং চিকিৎসকদের কর্মস্থলে উপস্থিতি নিশ্চিতকরণে মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তর থেকে মাঝে মাঝে আকস্মিক পরিদর্শন করা হয়, যদিও তা পর্যাপ্ত নয়।[১৩৪] অন্যদিকে ডাক্তাররা কর্মচারীদের সহযোগিতা সম্পূর্ণভাবে পায় না। এর জন্যে কর্মচারীদের কোনো জবাবদিহিতা নেই। কর্মচারীদের আচরণ এবং তাদের দায়িত্বে অবহেলা বিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বরাবর মৌখিক অভিযোগ জানানো হলেও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণে দুর্বলতা রয়েছে।

৩.৪.২ উচ্চশিক্ষায় তদারকি ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা: উচ্চশিক্ষায় প্রশিক্ষণার্থীদের তদারকি ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা রয়েছে। একজন প্রশিক্ষণার্থী নিয়মিত ক্লাশে উপস্থিত হচ্ছেন কিনা, বিশেষজ্ঞ হিসেবে সঠিকভাবে হাতে-কলমে কাজ শিখছেন কিনা, প্রতিদিন কী কাজ করছেন, ওটিতে কতগুলো দক্ষতাসম্পন্ন কাজ করছেন সেগুলোর যথাযথ তদারকিতে শিক্ষকদের দিক থেকে যেমন ঘাটতি রয়েছে, অন্যদিকে শিক্ষক নিয়মিত ক্লাস নিচ্ছেন কিনা সে বিষয়গুলোও যথাযথভাবে তদারকি করার জন্য কোনো কর্তৃপক্ষ কার্যকর ভূমিকা পালন করে না। উল্লেখ্য, প্রেষণ নীতিমালায় উচ্চশিক্ষায় প্রশিক্ষক এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের তদারকি কার্যক্রমের বিষয়টি সম্পর্কে কিছু বলা হয় নি।

৩.৫ উপসংহার

এ অধ্যায়ে বর্ণিত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন স্বাস্থ্যপ্রতিষ্ঠানে চিকিৎসাসেবায় সরকার পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন পদে ডাক্তার, নার্স, মেডিকেল টেকনোলজিস্ট নিয়োগ দিলেও অন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী তা সহনীয় পর্যায়ে পৌছানোর ক্ষেত্রে এখনো যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। তাছাড়া মৃত্যু, অবসর, উচ্চশিক্ষায় প্রেষণ, জনবল নিয়োগে দুর্নীতি ও অনিয়মের ঘটনায় নিয়োগ কার্যক্রমে স্থগিতাদেশ, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, নিয়োগ প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রতা প্রভৃতি কারণে স্বাস্থ্যখাতে জনবল সংকট আরও একটি বড় সমস্যা। যে কারণে নির্ধারিত স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের জন্য পদ তৈরি করা হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে পদায়ন দেওয়া সম্ভব হয় না। স্বাস্থ্যখাতের চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনায় দলীয় রাজনীতির প্রভাব এবং নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের লেনদেন মুখ্য ভূমিকা পালন করে। যেমন- বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও চিকিৎসকদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতিতে দলীয়করণ প্রাধান্য পায়। প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা ও মূল্যায়নেও রয়েছে দুর্বলতা। এতে একদিকে যেমন প্রশিক্ষণটি যথোপযুক্ত ব্যবহারের সুযোগ কম থাকে, অন্যদিকে দেশে দক্ষ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার তৈরিতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়। আবার স্বাস্থ্যখাতে তদারকি, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থায় রয়েছে দুর্বলতা, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও দুর্নীতি।

---

[১৩২] বিস্তারিত জানতে দেখুন, www.dhakatribune.com. ২৩/১০/২০১৩।

[১৩৩] স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে এক মতবিনিময় সভা থেকে প্রাপ্ত তথ্য; তারিখ: ২৮/০৮/২০১৪।

[১৩৪] *প্রাগুক্ত*।

অধ্যায় চার

ক্রয়, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ

৪.১ ভূমিকা

রোগীর চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম পরিচালনায় বিভিন্ন ধরনের ক্রয়, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ জড়িত। মেডিসিন সার্জিকেল রিকোয়ারমেন্ট (এমএসআর) খাতে প্রয়োজনীয় ওষুধ ও চিকিৎসা যন্ত্রপাতি এবং স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে অবস্থানরত রোগীর জন্য পথ্য খাতে ক্রয়-প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। এর পাশাপাশি বিভিন্ন চিকিৎসা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। স্বাস্থ্যখাতে এই ক্রয়, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণে বিভিন্ন ধরনের সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি বিদ্যমান যা স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট অংশীজন, টিআইবি'র জরিপ ও গবেষণা প্রতিবেদন, স্বাস্থ্যখাতের ওপর জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের অভিজ্ঞতাভিত্তিক পরামর্শ সভার বিবরণী, এবং গণমাধ্যম হতে জানা যায়। এ অধ্যায়ে চিকিৎসা কার্যক্রম সম্পাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট ক্রয় প্রক্রিয়া, সরবরাহ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণে বিভিন্ন সমস্যা, সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম-দুর্নীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

৪.২ স্বাস্থ্যখাতে বিভিন্ন ক্রয় ও তার প্রক্রিয়া

৪.২.১ পথ্য: সরকারি হাসপাতালের সাধারণ শয্যায় ভর্তিরত রোগীদের জন্য বিনামূল্যে তিনবেলা পথ্য সরবরাহ করা হয়। এছাড়া বিশেষ দিনগুলোতে (যেমন, বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস, ঈদ, শবে বরাত ও শবে কদর) উন্নতমানের পথ্য সরবরাহ করা হয়। এই সাধারণ শয্যার রোগীদের পথ্য সরবরাহে মাথাপিছু বরাদ্দ ১২৫ টাকা। নিয়ম অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান পথ্য সরবরাহে প্রতিযোগিতামূলক প্রক্রিয়া অনুসরণের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে দরপত্র আহবান করে এবং সর্বনিম্ন মূল্য প্রদানকারী ঠিকাদারকে পথ্য সরবরাহের জন্য নির্বাচন করা হয়। পথ্য সরবরাহের জন্য স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রতি বছরের এপ্রিল-মে মাসের মধ্যে দরপত্র আহবান থেকে শুরু করে ঠিকাদার নির্বাচনের কাজ সম্পন্ন করা হয়।

৪.২.২ ওষুধ ও চিকিৎসা যন্ত্রপাতি: এমএসআর কোডে ওষুধ ও চিকিৎসা যন্ত্রপাতির বরাদ্দ একসাথে দেওয়া হয়। এমএসআর খাতে রয়েছে: ওষুধপত্র (গ্রুপ- ক), যন্ত্রপাতি (গ্রুপ- খ), লিলেন সামগ্রী (গ্রুপ- গ), গজ, ব্যান্ডেজ, তুলা (গ্রুপ- ঘ), গ্যাস অক্সিজেন (গ্রুপ- ঙ), কেমিক্যাল (গ্রুপ- চ), আসবাবপত্র (গ্রুপ- ছ)। উল্লেখ্য, জেলা পর্যায়ে সিভিল সার্জনের কার্যালয় থেকে একটি অর্থবছরের জন্য সর্বোচ্চ দুই কোটি টাকার পণ্য ক্রয়ের বরাদ্দ দেওয়া হয়।

সারণি ৪.১: উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে ওষুধ ও চিকিৎসা যন্ত্রপাতি খাতে বরাদ্দ ও ক্রয় ক্ষমতা

উপজেলা পর্যায়ে	জেলা পর্যায়ে
বরাদ্দের ৭৫% ইডিসিএল হতে ওষুধ ক্রয়ে ব্যবহার করা হয়। বাকি ২৫% এমএসআর খাতে ক্রয়ে ব্যবহার করা হয়। ২৫% বরাদ্দের মধ্যে ২০% সিএমএসডি (সেন্ট্রাল মেডিকেল স্টোর ডিপো) থেকে চাহিদার প্রেক্ষিতে ক্রয় এবং ৫% সিভিল সার্জন অফিস কর্তৃক ক্রয় করা হয়। ২৫% বরাদ্দের মধ্যে ১০% সার্জিকেল সরঞ্জামাদি, ৫% লিনেন সামগ্রী (মশারি, বিছানার চাদর, বালিশ), ৪% গজ, ব্যান্ডেজ, তুলা, ১% অক্সিজেন গ্যাস, ২% কেমিক্যাল রি-এজেন্ট, এবং ৩% আসবাবপত্র।	৭০% বরাদ্দ ইডিসিএল হতে ওষুধ ক্রয়ে এবং ৩০% বরাদ্দ এমএসআর খাতে ক্রয়ে ব্যবহার করা হয়। ৩০% বরাদ্দের মধ্যে ২৫% সিএমএসডি থেকে চাহিদার প্রেক্ষিতে ক্রয় করা হয় এবং ৫% সিভিল সার্জন অফিস কর্তৃক ক্রয় করা হয়। ৩০% বরাদ্দের মধ্যে ২০% সিএমএসডি থেকে চাহিদার প্রেক্ষিতে ক্রয় এবং ৫% সিভিল সার্জন অফিস কর্তৃক ক্রয় করা হয়। ৩০% বরাদ্দের মধ্যে ১২% সার্জিকেল সরঞ্জামাদি, ৫% লিনেন সামগ্রী (মশারি, বিছানার চাদর, বালিশ), ৪% গজ, ব্যান্ডেজ, তুলা, ৩% অক্সিজেন গ্যাস, ৩% কেমিক্যাল রি-এজেন্ট, এবং ৩% আসবাবপত্র।

সেন্ট্রাল মেডিকেল স্টোর ডিপো (সিএমএসডি) অধিদপ্তর ও মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চাহিদার ভিত্তিতে ওষুধ ও চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়। স্থানীয় পর্যায়ের (উপজেলা এবং জেলা) প্রয়োজনীয়তা যাচাই করে চাহিদা চূড়ান্ত করা হয়। তারপর সেই চাহিদা সংকলিত আকারে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হাসপাতাল শাখায় পাঠানো হলে তারা প্রতিস্বাক্ষর করে সিএমএসডিতে পাঠায়। পরবর্তীতে সিএমএসডি এসব হাসপাতালে ওষুধ ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে।

৪.২.৩ ইডিসিএল কর্তৃক ওষুধ ক্রয় প্রক্রিয়া: ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলার চাহিদার ভিত্তিতে সিভিল সার্জন অফিস ক্রয়-পরিকল্পনা তৈরি করে ওষুধের চাহিদা পাঠালে ইডিসিএল সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোতে ওষুধ সরবরাহ করে। পরবর্তীতে ইডিসিএল বরাবর বিল ইস্যু করা হয়।

৪.৩ পথ্য ক্রয়ে সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি

৪.৩.১ পথ্যের ঠিকাদার নির্বাচনে দলীয় প্রভাবঃ দলীয় আধিপত্যের কারণে সব আগ্রহী ঠিকাদারের দরপত্রে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে না। সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ শয্যা অনুযায়ী পথ্য সরবরাহে বহুল প্রচারিত পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রতি অর্থবছরের শুরুতে দরপত্র আহবান করে। একাধিক সিভিল সার্জন জানান, রাজনৈতিক দলের সমর্থনপুষ্ট ঠিকাদাররা নিজেদের মধ্যে 'সিন্ডিকেট' গড়ে তোলে এবং নিজেরা কাজ পেতে ক্রয় কমিটির সদস্যদের সাথে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমঝোতা করে, অথবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবৈধ রাজনৈতিক প্রভাব খাটায়।

৪.৩.২ বাজারমূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যের দরপত্রধারীকে কাজ দেওয়া এবং অর্থের অপচয়ঃ কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাজার মূল্য যাচাই না করে পথ্যের ঠিকাদার নির্বাচন করা হয়। এক্ষেত্রে অর্থের অপচয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ, তৃতীয় পর্যায়ের একটি হাসপাতালের নিরীক্ষা প্রতিবেদন হতে জানা যায় বাজারমূল্য অপেক্ষা অস্বাভাবিক অধিক মূল্যে ফার্মের মুরগীর মাংস ও বিদেশী রুই মাছ সরবরাহ নেওয়ায় **১২** লক্ষ ৬০ হাজার ৬৪৩ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হয়।[১৩৫] এ প্রসঙ্গে জেলা সদর হাসপাতালের সংশ্লিষ্ট সিভিল সার্জন জানান, উক্ত হাসপাতালের পণ্য ক্রয়ে জেলা মার্কেটিং কর্মকর্তার নিকট হতে বাজার মূল্যের তথ্য নেওয়া হয়। কিন্তু হাসপাতালের ক্রয় কমিটি কর্তৃক অনেকক্ষেত্রে বাজার মূল্য যাচাই না করে মার্কেটিং কর্মকর্তার সাথে যোগসাজশে বাজার মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে দরপত্র দেয়।

৪.৩.৩ ঠিকাদার কর্তৃক ভুয়া বিল জমাঃ হাসপাতালের কর্মকর্তা-কর্মচারীর সহযোগিতায় ভুয়া বিল তৈরি করে ঠিকাদার অতিরিক্ত অর্থ আত্মসাৎ করে। যেমন, একটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স **৩১** শয্যা থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীত হলেও পাঁচ মাস পর্যন্ত এই অতিরিক্ত **১৯** শয্যা চালু হয় নি, অন্যদিকে প্রতিদিন ২০ জন রোগী থাকত। অথচ সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার হাসপাতালের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে যোগসাজশ করে ২০১৩ সালের ২০ আগস্ট থেকে ২০১৪ সালের ২০ জানুয়ারি (পাঁচ মাস) পর্যন্ত ৫০ জন রোগীর তিন বেলা পথ্যের বিল তৈরি করে উত্তোলন করে। এ হিসাবে অতিরিক্ত তিন লাখ ৪১ হাজার ৯১৬ টাকার অপচয় হয়।[১৩৬]

৪.৩.৪ হাসপাতালের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ঃ হাসপাতালে প্রতি মাসে সরবরাহকৃত পথ্যের মূল্যছাড় করাতে গিয়ে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ঠিকাদারের কাছ থেকে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অর্থ আদায় করে।

৪.৩.৫ রোগীর একাংশের হাসপাতাল হতে সরবরাহকৃত পথ্য গ্রহণ না করা এবং পথ্যের অপচয়ঃ কোনো কোনো ক্ষেত্রে রোগীর একাংশ হাসপাতাল হতে সরবরাহকৃত পথ্য গ্রহণ না করায় পথ্যের অপচয় হয়। উদাহরণস্বরূপ, তৃতীয় পর্যায়ের একটি হাসপাতালে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ২০০ রোগী (সর্বনিম্ন হিসেবে) সরবরাহকৃত পথ্য গ্রহণ করেন না। এতে প্রতিদিন গড়ে প্রায় **১৫,০০০** টাকার (পূর্বের বরাদ্দকৃত ৭৫ টাকা হিসেবে) পথ্য অপচয় হয়। এই হিসেবে বছরে অপচয় হয় গড়ে প্রায় ৫৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা।[১৩৭] একজন সিভিল সার্জন জানান, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই অতিরিক্ত পথ্য বাইরে বিক্রি করা হয় বা হাসপাতালের কর্মচারীরা বাড়িতে নিয়ে যায়।

৪.৩.৬ পথ্যের মান নিয়ন্ত্রণে দুর্বল তদারকি ব্যবস্থাপনাঃ পথ্যের গুণগত ও পরিমাণগত মান নিয়ন্ত্রণে হাসপাতালগুলোতে তদারকি ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয়। এ প্রসঙ্গে একটি জেলা সদর হাসপাতালের সংশ্লিষ্ট অংশীজন জানান, তার হাসপাতালে পথ্যের মান নিয়ন্ত্রণে আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা, নার্সিং সুপারভাইজার এবং হিসাবরক্ষক কর্মকর্তার সমন্বয়ে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করা হলেও এই কমিটি সক্রিয় নয়। অন্য এক প্রতিবেদন হতেও জানা যায়, পথ্য বুঝে নেওয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিটি যথাযথভাবে তদারকি কার্যক্রম করে না।[১৩৮] তদারকি ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী না হওয়ায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিমাণমতো সকল দ্রব্যও সরবরাহ করা হয় না।

৪.৪ ওষুধ ও চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ক্রয় ও সরবরাহে সমস্যা, দুর্নীতি ও অনিয়ম

৪.৪.১ ঠিকাদার নির্বাচনে দলীয় রাজনীতির প্রভাবঃ দলীয় রাজনৈতিক প্রভাব এবং হুমকি থাকায় সকল আগ্রহী ঠিকাদার প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র প্রক্রিয়ায় দরপত্রে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায় না। অনেক ক্ষেত্রে অবৈধভাবে রাজনৈতিক প্রভাব ব্যবহার

---

[১৩৫] বিস্তারিত জানতে দেখুন, বিশেষ অডিট রিপোর্ট (**১৯৯৮-১৯৯৯** হতে ২০০৫-২০০৬); বাংলাদেশ কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল।

[১৩৬] *দৈনিক প্রথম আলো*, ৬ এপ্রিল ২০১৪।

[১৩৭] *প্রাগুক্ত*।

[১৩৮] *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৩ অক্টোবর ২০১৩।

করে দরপত্র কমিটির সদস্যদের বদলি করে দেওয়ার ভয় দেখানো হয় বা হয়রানি ও শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করা হয়। এর ফলে অনেকক্ষেত্রে অযোগ্য ঠিকাদাররা পণ্য সরবরাহের কাজ পাওয়ায় পণ্যের গুণগত ও পরিমাণগত মান রক্ষা করে না।

৪.৪.২ চাহিদা মোতাবেক ওষুধ সরবরাহ না করা: জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট অংশীজন হতে জানা যায়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইডিসিএল বরাবর নির্দিষ্ট ওষুধের চাহিদা পাঠানো হলেও তা সরবরাহ করা হয় না, বরং ছয়মাস বা এরও কম মেয়াদসম্পন্ন ও অপ্রয়োজনীয় ওষুধ, যেগুলোর চাহিদা দেওয়া হয় নি তা, সরবরাহ করা হয়। এ প্রসঙ্গে একটি জেলার সিভিল সার্জন জানান, অন্য একটি গ্রুপের ওষুধ, যার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার সময় খুবই সন্নিকটে, এ ধরনের ওষুধ মাঝে মাঝে বেশি পরিমাণে সরবরাহ করা হয়। আবার ক্যালসিয়াম-জাতীয় ওষুধ ও বাচ্চাদের ওষুধের প্রয়োজন বেশি হলেও সরবরাহ করা হয় সেভ্রাডিন ও এমাক্সিসিলিন জাতীয় এন্টিবায়োটিক ওষুধ।

৪.৩.৩ উচ্চ মূল্যে ওষুধ ক্রয়: সরকারি প্রতিষ্ঠান ইডিসিএল থেকে ওষুধ ক্রয়ের নির্দেশনা থাকলেও একটি নিরীক্ষা প্রতিবেদনে দেখা যায়, ২০০৬ হতে ২০০৯ অর্থবছরে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন দুটি মেডিকেল কলেজ, দুটি সিভিল সার্জন অফিস, এবং একটি প্রতিষ্ঠান সাধারণ সরবরাহকারী হতে উচ্চ মূল্যে ওষুধ ক্রয় করে। এর ফলে সরকারের ৩ কোটি ২০ লাখ টাকা ক্ষতি হয়।[১৩৯]

৪.৩.৪ স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের চাহিদা না থাকা সত্ত্বেও মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের যোগসাজশে যন্ত্রপাতি ক্রয়: বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে যন্ত্রপাতি সরবরাহে অধিদপ্তর এবং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চাহিদার ভিত্তিতে সিএমএসডি প্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয় ও সরবরাহ করে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অংশীজন হতে জানা যায়, কিছু ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে কোনো চাহিদা না পাঠালেও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ঠিকাদার, সিএমএসডি, এবং মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা যোগসাজশ করে যন্ত্রপাতি ক্রয় করে এবং স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে সরবরাহ করে।[১৪০] এক্ষেত্রে জড়িতদের মধ্যে কমিশনের চুক্তি হয়। প্রয়োজন না থাকায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে এসব যন্ত্র ব্যবহারের সুযোগ কম থাকে। এ প্রসঙ্গে এক প্রতিবেদনে পাওয়া যায়, বিভিন্ন সরকারের সময়ে দেশের বিভিন্ন সরকারি মেডিকেল কলেজ, সদর হাসপাতাল, এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানো ৫৮৫টি যন্ত্র বাক্সবন্দী অবস্থায় অর্থাৎ অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে।[১৪১] অন্য একটি প্রতিবেদন হতে জানা যায়, ২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩ এই চার অর্থবছরে জেলা ও উপজেলা হাসপাতালের প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও ২০ কোটি টাকা মূল্যে ৫৪৭টি চিকিৎসা যন্ত্র কেনা হয়, যেগুলো সরবরাহের পর থেকে অব্যবহৃত রয়েছে।[১৪২] আবার চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে খোলাবাজারে যে যন্ত্রপাতির দাম পাঁচ-ছয় কোটি টাকা, সেটির দাম সরকারি হাসপাতালের দরপত্রে রাখা হয় ১০-১২ কোটি টাকা।[১৪৩] তবে সম্প্রতি (২৪ জুন ২০১৪) চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ও ওষুধ চাহিদার ভিত্তিতে ক্রয়ে বিভিন্ন শর্তাবলী উল্লেখ করে মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিপত্র জারি করা হয়।

৪.৩.৫ ঠিকাদারের বিল হতে বিভিন্ন পর্যায়ে কমিশন আদায়: স্থানীয় পর্যায়ে এমএসআর খাতে পণ্য ক্রয়ে ঠিকাদারকে বিভিন্ন পর্যায়ে কমিশন দিতে হয়। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও ঠিকাদারদের কাছ থেকে জানা যায়, একজন ঠিকাদারকে ক্রয়ের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের ২০% বিভিন্ন পর্যায়ে কমিশন দিতে হয় (সারণি ৪.২)। এর জন্য ঠিকাদার নির্দিষ্ট পণ্যের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের সম্পূর্ণটা সেই পণ্য ক্রয়ে ব্যবহার করে না।

সারণি ৪.২: ঠিকাদারের বিল হতে কমিশন আদায়ের হার

কমিশন আদায়কারী	কমিশনের হার (শতাংশ)
সিভিল সার্জন	৩%
হিসাবরক্ষক (যে বিল তৈরি করে)	১%
স্টোর কিপার	৫%
রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ	১০%
অফিসের অন্যান্য স্টাফ (পিয়ন, আয়া, প্রধান সহকারী, ক্যাশিয়ার)	১%

তথ্যসূত্র: ঠিকাদার ও সংশ্লিষ্ট অংশীজন।

[১৩৯] Office of the Comptroller and Auditor General of Bangladesh, *Annual Report-2011*, www.cag.org.bd; Special/ Issue based Audit.

[১৪০] একটি জেলা সদর হাসপাতালে ২০১০ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে অপারেশন যন্ত্র, যেমন হাইড্রোলিক ওটি টেবিল, স্টেরিলাইজার, সেন্ট্রিফিউজ মেশিনসহ মোট দশটি চিকিৎসাযন্ত্র দেওয়া হয়, যদিও হাসপাতাল থেকে যন্ত্রগুলোর কোনো চাহিদাপত্র ছিল না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় সাভার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৬টি হাইড্রোলিক ওটি টেবিল, নোয়াখালীর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে ৬টি সহ সারাদেশে এরকম ৬০টি হাইড্রোলিক ওটি টেবিল সরবরাহ করা হয়েছে; যেগুলো কাজে আসছে না। বিস্তারিত জানতে দেখুন *দৈনিক যুগান্তর*, ৩ জুন ২০১৩।

[১৪১] *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৬ জুলাই ২০১৩।

[১৪২] *দৈনিক যুগান্তর*, ৩ জুন ২০১৩।

[১৪৩] *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪।

৪.৩.৬ নির্দিষ্ট মানের পণ্য সরবরাহ না করা: সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান অনেকক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মান ও বৈশিষ্ট্যের পণ্য সরবরাহ না করে নিম্ন মানের পণ্য সরবরাহ করে। এ প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট জেলা সদর হাসপাতালের কয়েকজন অংশীজন জানান, শিডিউলে লাল পশমি কালো বর্ডার যুক্ত কম্বল সরবরাহ করার কথা বলা হলেও তা দেওয়া হয় নি, আবার অনেকক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মাপের আসবাবপত্রও দেওয়া হয় নি। পথ্যের ক্ষেত্রেও অনেকক্ষেত্রে হাসপাতালের প্রতিদিনের তালিকা অনুযায়ী পথ্য সরবরাহ করা হয় নি বা নিম্নমানের পথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। দরপত্র প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক প্রভাব থাকায় অনেকক্ষেত্রে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বা মালামাল গ্রহণ কমিটি কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে না। এছাড়াও পণ্য গ্রহণে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাথে ঠিকাদারের সমঝোতার মাধ্যমে দুর্নীতি ও অনিয়ম হয়।

৪.৫ রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা

৪.৪.১ জ্বালানি তেলের বরাদ্দ পর্যাপ্ত না থাকা: স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে অ্যাম্বুলেন্স ও জেনারেটর সরবরাহ করা হলেও এসব চালানোর জন্য জ্বালানির বরাদ্দ পর্যাপ্ত নয়। অ্যাম্বুলেন্সের জন্য মাসিক ভিত্তিতে ১০ হাজার টাকার জ্বালানি বরাদ্দ রয়েছে, যা প্রয়োজনের তুলনায় কম। এছাড়া হাওর অঞ্চলে বরাদ্দকৃত নৌ-অ্যাম্বুলেন্সের জন্য জ্বালানি তেল কেনা বাবদ কোনো অর্থ বরাদ্দ রাখা হয় নি।[১৪৪]

হাসপাতালে রোগীর চিকিৎসাসেবা কার্যক্রমে বিদ্যুৎ সরবরাহ অবিচ্ছিন্ন রাখতে সরকার বিভিন্ন পর্যায়ের হাসপাতালে জেনারেটর সরবরাহ করেছে। সিএমএসডি'র এক হিসাবে দেখা যায়, ২০০৩ থেকে ২০১১ পর্যন্ত মোট ২৪টি জেনারেটর (৪০ থেকে ৬০ কেভিএ শক্তিসম্পন্ন) জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠানো হলেও জেনারেটর চালানোর জন্য জ্বালানি তেলের বরাদ্দ না দেওয়ায় সেগুলোর একটিও চালু করা সম্ভব হয় নি।[১৪৫]

৪.৪.২ চিকিৎসকদের আবাসন নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ না হওয়া: টিআইবি'র স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ সভা থেকে জানা যায়, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোতে কর্মরত সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকদের থাকার জন্য আবাসন নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না। পরামর্শ সভা থেকে জানা যায়, একটি উপজেলায় বরাদ্দের অভাবে ডাক্তারদের জন্য শুরু হওয়া চারতলার ফাউন্ডেশনের কাজ শুরু হলেও একতলা করা হয়েছে, বাকি তিনতলা করা সম্ভব হয় নি।

৪.৪.৩ পণ্য রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা: সিভিল সার্জন অফিসে প্রয়োজনীয় মানসম্মত গুদামঘর নেই। এছাড়া প্রায় সব উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ওষুধ ও অন্যান্য মালামাল রাখার জন্য নির্দিষ্ট কোনো গুদামঘর নেই। এসব ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কোনো একটি কক্ষকে গুদামঘর হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তাই বিভিন্ন টিকাদান প্রচারণা ও দুর্যোগকালীন কেন্দ্র হতে এক সাথে বেশি পরিমাণ মালামাল সরবরাহ করা হলে এসব দ্রব্য খোলা জায়গায় রাখা হয়। এতে মালামাল চুরি, হারিয়ে যাওয়া বা নষ্ট হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। এ প্রসঙ্গে রিপোর্ট কার্ড জরিপ ২০১১, ২০১২ ও ২০১৩ হতে জানা যায়, কিছু জেলা সদর হাসপাতালে পর্যাপ্ত পরিমাণে জায়গা না থাকার কারণে ওষুধ/স্যালাইন মেঝেতে ফেলতে রাখা হয় এবং হাসপাতালের ভবনে ফাটল ধরায় স্টোরের ভিতরে পানি পড়ে; যা ওষুধ রক্ষণাবেক্ষণে অসুবিধে হয়।

৪.৬ মেরামত ও সংস্কারে সমস্যা, দুর্নীতি ও অনিয়ম

চিকিৎসা যন্ত্রপাতি নষ্ট হলে নিমিউ এবং সরকারি অ্যাম্বুলেন্স মেরামতে রয়েছে ট্রান্সপোর্ট অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট মেইনটেনেন্স অর্গানাইজেশন (টেমো) এবং হাসপাতালের ভবন মেরামত ও সংস্কার কাজে রয়েছে স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর। নিম্নে এসব প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি ও অনিয়ম আলোচনা করা হল:

৪.৫.১ চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ও সরকারি অ্যাম্বুলেন্স: জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের যন্ত্রপাতি মেরামতের প্রয়োজনে স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠান সিএমএসডি বরাবর পত্র দেয়। সিএমএসডি এগুলো মেরামতের জন্য নিমিউকে অনুরোধ করে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট অংশীজন হতে জানা যায়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় জনবল না থাকার কারণে[১৪৬] নিমিউ মেরামতে সামর্থ্য নেই বলে অনাপত্তিপত্র (এনওসি) দেয়[১৪৭], আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে কমিশনের বিনিময়ে এনওসি দেয়। এ সকল ক্ষেত্রে প্রতিটি এনওসি'র জন্য

---

[১৪৪] *দৈনিক যুগান্তর*, ৪ জুন ২০১৩।

[১৪৫] *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৬ জুলাই ২০১৩।

[১৪৬] বর্তমান জনবলের অবকাঠামো দ্বারা সমগ্র বাংলাদেশের হাসপাতাল যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কার্য যথাসময়ে সঠিকভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১১ (নবম অধ্যায়)।

[১৪৭] ২০১১ সালের অক্টোবরে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইন্সটিটিউটে এমআরআই মেশিন (ব্যয় প্রাক্কলন করা হয় ১৫ লাখ চুয়াত্তর হাজার টাকা), হৃদরোগ ইন্সটিটিউটে এনজিওগ্রাম মেশিন (ব্যয় প্রাক্কলন করা হয় ২৯ লাখ ৯৫ হাজার টাকা) মেরামত করা হয়। ২০১২ সালের জানুয়ারি এবং মে মাসে ঢাকা

মেরামতে যে অর্থ ব্যয় হয় তার প্রায় ১০% নিমিউ কর্মকর্তাকে ঘুষ হিসেবে অগ্রিম দিতে হয়।[১৪৮] নিমিউ এনওসি দিলে সিএমএসডি বাইরের প্রতিষ্ঠান হতে এগুলো মেরামতের জন্য দরপত্র আহবান করে। এ প্রসঙ্গে সাবেক স্বাস্থ্য মন্ত্রী জানান, অনেকক্ষেত্রে পরিকল্পিতভাবে হাসপাতালের অতি জরুরি মূল্যবান যন্ত্রপাতি নষ্ট করা হয়।[১৪৯]

সরকারি অ্যাম্বুলেন্স মেরামতের প্রয়োজন হলে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে টেমোতে রিক্যুইজিশন দেওয়া হয়। কিন্তু দেখা যায়, টেমোতে জনবল স্বল্পতায় বিকল অ্যাম্বুলেন্সগুলো পড়ে থাকে দীর্ঘদিন। এছাড়া সরকারি ভবন মেরামত ও সংস্কার কাজে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কাজ যেমন যথার্থভাবে না করে এবং সংস্কার কাজ না করেই ঠিকাদার কর্তৃক টাকা তুলে নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।[১৫০]

৪.৭ উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, স্বাস্থ্যখাতে ক্রয়, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণে বিভিন্ন ধরনের সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি বিদ্যমান। এর মধ্যে রয়েছে, দলীয় রাজনৈতিক প্রভাব, অবৈধ কমিশন চুক্তি, নিম্নমানের পণ্য সরবরাহ, পণ্য ক্রয় ও সরবরাহে চাহিদা যাচাই না হওয়া, পর্যাপ্ত বরাদ্দ না থাকা ইত্যাদি। যেমন, বেশিরভাগ ক্রয়ে দলীয় রাজনৈতিক প্রভাব মুখ্য নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। এতে সকল ঠিকাদার কাজ পাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। অন্যদিকে স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের চাহিদা না থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় পর্যায়ের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের যোগসাজশে যন্ত্রপাতি ক্রয় ও সরবরাহ করা হয়। এতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোতে জনবল ও অবকাঠামোগত সমস্যার কারণে এ সকল যন্ত্রের অব্যবহৃত থাকে। ফলে সরকারি সম্পদ অপচয় হয়। এ ধরনের দুর্নীতি ও অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে বিভিন্ন হারে অবৈধ কমিশনের লেনদেন হয়। তাছাড়া পণ্য রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনায় যেমন দুর্বলতা রয়েছে, তেমনি অর্থের অভাবে চিকিৎসকদের আবাসন নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণও করা সম্ভব হয় না। অন্যদিকে, অ্যাম্বুলেন্স রক্ষণাবেক্ষণে তেলের বরাদ্দ যেমন পর্যাপ্ত নয়, তেমনি বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে রোগীর চিকিৎসাসেবা কার্যক্রমে জেনারেটর সরবরাহ করা হলেও তা রক্ষণাবেক্ষণে তেলের বরাদ্দ দেওয়া হয় নি। সর্বোপরি এ সকল কারণে রোগীরা সঠিক সময়ে পর্যাপ্ত সু-চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

মেডিকেলে একটি (ব্যয় প্রাক্কলন করা হয় ৯ লাক ৩ হাজার ৫শ টাকা) এবং জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইন্সটিটিউটে (ব্যয় প্রাক্কলন করা হয় এক কোটি ৬৮ লাখ ৫ হাজার টাকা) একটি লিনিয়ার এক্সিলারেটর মেশিন মেরামত করা হয়। নিমিউ এ সবকটি ক্ষেত্রে অনাপত্তিপত্র (এনওসি) দেয়। বিস্তারিত জানতে দেখুন *দৈনিক যুগান্তর*, ৫ জুন ২০১৩।

[১৪৮] *প্রাগুক্ত*।

[১৪৯] জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অভিজ্ঞতা ভিত্তিক পরামর্শ সভায় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বক্তব্য থেকে প্রাপ্ত তথ্য যা ৩/০৭/২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

[১৫০] ২০১৩ সালের মে মাসে গাইবান্ধা সদর হাসপাতাল, সুন্দরগঞ্জ, সাঘাটা, ফুলছড়ি ও সাদুল্যাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমেপ্লক্স ভবন সংস্কারের জন্য মোট ২৪ লাখ সাত হাজার টাকা ব্যয়ে দরপত্র আহবান করা হয়। এর মধ্যে সাদুল্যাপুর স্বাস্থ্য কমেপ্লেক্সের জন্য তিন লাখ ৯৩ হাজার টাকা। প্রত্যেক এলাকাতেই ঐ বছরের আগস্টে কাজ সম্পন্ন দেখানো হয়। অথচ ২২ মার্চ ২০১৪ তারিখে ঐ হাসপাতালের নৈশপ্রহরী জানান, তিনি তিন বছর ধরে হাসপাতালের কোয়ার্টারে বসবাস করছেন, কোথাও সংস্কার কাজ করতে দেখেন নি। এ প্রসঙ্গে গাইবান্ধার সংশ্লিষ্ট অংশীজন জানান, প্রতিবছর সংস্কারের নামে লাখ লাখ টাকা লুটপাট হয়, কিন্তু কাজ হয় না। দরজা-জানালা ও ঘরের দেওয়াল না ঘষেই রং দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। বিস্তারিত জানতে দেখুন *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৬ মার্চ ২০১৪।

অধ্যায় পাঁচ

সরকারি স্বাস্থ্য সেবামূলক কার্যক্রমে সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি

৫.১ ভূমিকা

বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান যেমন, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, জেলা সদর হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল রোগীদের তিনটি বিভাগ যেমন, অন্তর্বিভাগ, বহির্বিভাগ এবং জরুরি বিভাগের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা দেয়। এছাড়াও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, এবং কমিউনিটি ক্লিনিক হতে বহির্বিভাগীয় চিকিৎসাসেবা দেওয়া হয়। উপজেলা, জেলা এবং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বহির্বিভাগ হতে রোগীদের প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা ও ব্যবস্থাপত্র এবং ওষুধ দেওয়া হয়। প্রাথমিক চিকিৎসা সেবায় ডাক্তার দেখানোর জন্য অতি অল্প মূল্যে টিকিট ক্রয় করতে হয় এবং ডাক্তারের পরামর্শ (প্রেসক্রিপশন) অনুসারে বিনামূল্যে ওষুধ পাওয়া যায়। জরুরি বিভাগ হতে রোগীদের ২৪ ঘন্টা চিকিৎসাসেবা দেওয়া হয় এবং রোগীর শারীরিক অবস্থা বিবেচনায় আরও চিকিৎসার প্রয়োজন হলে তাকে অন্তর্বিভাগে ভর্তি করা হয়। অন্তর্বিভাগে ভর্তিরত রোগীরা জরুরি বিভাগ এবং বহির্বিভাগের মাধ্যমে ভর্তি হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে রোগের ধরন অনুযায়ী নির্ধারিত সেকশনে রোগীকে ভর্তি করা হয়। ভর্তিরত রোগীরা বিনামূল্যে সাধারণ শয্যা পেয়ে থাকে এবং তাদের অপারেশন বিনামূল্যে করা হয়। উপজেলা পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিক হতে বহির্বিভাগীয় প্রাথমিক চিকিৎসাসেবা গ্রহণে কোনো টিকিট ক্রয় করতে হয় না, শুধু নাম নিবন্ধন করতে হয়। স্বল্পমূল্যে এবং বিনামূল্যে দুঃস্থ ও গরীব রোগীর সাহায্যার্থে জেলা সদর হাসপাতাল এবং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসমূহে সমাজ সেবা কার্যক্রম চালু রয়েছে।[১৫১]

দেশব্যাপী স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের বিস্তৃতি এবং স্বাস্থ্যখাতে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত উদ্যোগের ফলে অনেক স্বাস্থ্যসূচকে (যেমন শিশু মৃত্যুর হার, মাতৃ-মৃত্যুর হার, প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল, উর্বরতার হার) উন্নতি হলেও এই ধারাকে অব্যাহত রাখতে এবং স্বাস্থ্যসেবা আরও প্রসারিত, কার্যকর ও টেকসই করার পথে রয়েছে নানা প্রতিবন্ধকতা। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল, বিভিন্ন পর্যায়ের স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিদ্যমান নানা ধরনের সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি। বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্যসেবা নিতে গিয়ে জনগণ কী ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়, এবং এক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা কী কী তা এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হল। উল্লেখ্য, এসব পর্যবেক্ষণ বিভিন্ন পর্যায়ের স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের[১৫২] ভিত্তিতে হলেও এটি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সব ডাক্তার, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও চিকিৎসাসেবা গ্রহণকারী সব রোগীর ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়।

৫.২ সার্বিকভাবে স্বাস্থ্যসেবায় অনিয়ম ও দুর্নীতি

টিআইবি'র জাতীয় খানা জরিপে (২০১২) দেখা যায়, যেসব খানা সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান হতে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করেছে তাদের ৪০.২% কোনো না কোনো সেবা নিতে গিয়ে অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়েছে।[১৫৩] জরিপে সেবাগ্রহণকারী খানার ২১.৫%-কে বিভিন্ন সেবা পেতে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে (রশিদ ছাড়া) অর্থ দিতে হয়েছে। নিয়ম বহির্ভূত অর্থ দেওয়ার কারণ হিসেবে ৩১.৭% দ্রুত সেবা পাওয়ার জন্য, ২৭.২% ভালো সেবা পাওয়ার জন্য এবং ৪৬.৫% খানা অর্থ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না বলে উল্লেখ করেন।

৫.২.১ প্রতিষ্ঠানভেদে স্বাস্থ্যসেবায় অনিয়ম ও দুর্নীতি: টিআইবি'র জাতীয় খানা জরিপে (২০১২) সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের ধরন অনুযায়ী দুর্নীতি ও অনিয়মের মাত্রায় পার্থক্য লক্ষ করা যায় - দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হওয়ার হার সবচেয়ে বেশি (৩৫%) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে, আর সবচেয়ে কম ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র (১০.৪%) ও অন্যান্য স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে[১৫৪] (৭.২%)।

---

[১৫১] এই বিভাগ হতে যেসব সেবা পাওয়ার যায় তা হল বর্হিবিভাগের রোগীদের বিনামূল্যে পরামর্শ প্রদান, ওষুধ প্রদান, বিনামূল্যে চশমা প্রদান, বিশেষ প্রয়োজনে বিনামূল্যে রক্ত দেওয়া, রোগী আরোগ্য লাভের পর হাসপাতাল থেকে বাড়ি যেতে না পারলে যাতায়াত ভাড়া দেওয়া, রোগী আরোগ্য লাভের পর রোগীর বাড়িতে গিয়ে খোজ-খবর নেওয়া, আগুনে পোড়া রোগীর বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা ইত্যাদি। এছাড়াও ডাক্তারের সুপারিশের প্রেক্ষিতে অসহায় ও দুস্থ রোগীদের হাসপাতালে টিকিট ক্রয়, ভর্তি ফি, ওষুধ, বিভিন্ন পরীক্ষার ফি প্রদানের ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে।

[১৫২] টিআইবি'র জাতীয় খানা জরিপ ২০১২; যেখানে ৬৪টি জেলায় সরকারি স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণকারী মোট খানা ছিল ৩,২০৮, ২৮টি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের ওপর (উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৩টি, জেলা সদর হাসপাতাল ২৩টি, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ২টি) ২৮টি রিপোর্ট কার্ড জরিপ; যেখানে মোট উত্তরদাতা ১৪,২৭৬; টিআইবি'র স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ সভা; যেখানে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অংশীজন (১৩৫) স্বাস্থ্যখাতের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ নিয়ে মতামত ব্যক্ত করেন।

[১৫৩] এর মধ্যে গ্রামাঞ্চলে সেবাগ্রহণকারীদের ৩৮.৯% এবং শহরাঞ্চলে সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে ৪২.৬% দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয়।

[১৫৪] অন্যান্য স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের ধরনের মধ্যে রয়েছে বিশেষায়িত হাসপাতাল, সরকারি মাতৃসদন ইত্যাদি।

৫.২.২ ডাক্তারি সেবা: স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে জরুরি ও অন্তর্বিভাগে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য সহকারীদের রোস্টার ভিত্তিতে ২৪ ঘন্টা দায়িত্ব পালন করার নিয়ম থাকলেও এর ব্যত্যয় লক্ষ করা যায়। উপজেলা পর্যায়ে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবস্থান করার নিয়ম থাকলেও চিকিৎসকদের অনেকে কর্মস্থলে যেমন নিয়মিত উপস্থিত হন না, তেমনি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতালে কোনো কোনো চিকিৎসক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত থাকেন না। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ের এক তদন্তে দেখা গিয়েছে, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কর্মরত চিকিৎসকদের ৮০ শতাংশ কর্মস্থলে উপস্থিত থাকেন না।[১৫৫] মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা কয়েকটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও ইউনিয়ন সাব-সেন্টার পরিদর্শনে গিয়ে দেখেন, ডিউটি রোস্টারে উপস্থিত দেখানো হলেও সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকরা কর্মস্থলে উপস্থিত ছিলেন না; শুধু তাই নয় মাসের পর মাস কর্মস্থলে অনুপস্থিত থেকে তারা রাজধানী অথবা পার্শ্ববর্তী এলাকায় বেসরকারি ক্লিনিকে কর্মরত ছিলেন।[১৫৬] অন্য এক প্রতিবেদন হতে জানা যায়, দুটি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে পদায়নকৃত দুইজন চিকিৎসক দীর্ঘদিন ধরে কাজে অনুপস্থিত এবং একটি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের একজন মেডিকেল কর্মকর্তা দীর্ঘ তিন বছর সপ্তাহে মাত্র একদিন কর্মস্থলে উপস্থিত হয়ে মাসের শেষে স্বাক্ষর করে বেতন তুলে নেন।[১৫৭] এ প্রসঙ্গে জাতীয় খানা জরিপে (২০১২) দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হওয়া সেবাগ্রহণকারী খানাগুলোর ১১.৪% জরুরি মুহূর্তে ডাক্তার/ স্বাস্থ্য সহকারী পায় নি বলে জানায়। হাসপাতালের ধরনভেদে এ হার সবচেয়ে বেশি বিশেষায়িত হাসপাতাল (১২.৪%) এবং জেনারেল/সদর হাসপাতালে (৬.৮%)। টিআইবি পরিচালিত রিপোর্ট কার্ড জরিপ (২০১১, ২০১২, ২০১৩) এবং ডায়াগনস্টিক গবেষণা (২০১৩)[১৫৮] হতেও জানা যায়, বহির্বিভাগের কিছু কিছু ইউনিটে কর্তব্যরত ডাক্তারদের কিছু নির্ধারিত সময়ের (সকাল ৮টা হতে দুপুর ২.৩০টা) অনেক পরে আসে এবং নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার পূর্বেই হাসপাতাল ত্যাগ করে। অন্তর্বিভাগে চিকিৎসাসেবা গ্রহণকারী রোগীরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে জরুরি প্রয়োজনে ডাক্তার না পাওয়ার কথা জানিয়েছে।

সংশ্লিষ্ট অংশীজন হতে জানা যায়, ওয়ার্ড পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিক সকাল আটটা থেকে দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত খোলা রাখার নিয়ম থাকলেও তা লঙ্ঘন করে ক্লিনিকগুলো নিয়মিতভাবে খোলা হয় নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে। প্রতিটি ক্লিনিকে স্বাস্থ্য সহকারীদের পদায়ন দেওয়া হয়। এর মধ্যে সপ্তাহে তিন দিন থাকবেন স্বাস্থ্য সহকারী এবং তিনদিন থাকবেন পরিবার কল্যাণ সহকারী। কিন্তু বাস্তবে এই সকল স্বাস্থ্য সহকারী ও পরিবার কল্যাণ সহকারীরা নিয়মিতভাবে কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে দায়িত্ব পালন করেন না। এ প্রসঙ্গে এক প্রতিবেদন হতে জানা যায়, যশোরের মনিরামপুর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে কমিউনিটি ক্লিনিক রয়েছে ৩৬টি। এ উপজেলার অধিকাংশ কমিউনিটি ক্লিনিক তালা বন্ধ থাকে। ফলে রোগীরা এসব ক্লিনিকের সেবা কার্যক্রম হতে বঞ্চিত। উদাহরণস্বরূপ, চালুয়াহাটি ইউনিয়নের কমিউনিটি ক্লিনিকে বেলা দেড়টা পর্যন্ত রোগীরা অপেক্ষা করার পরও কাউকে না পেয়ে তারা ফিরে যায়। শুধু এ উপজেলায় নয়, রোহিতা, মনোহরপুর, খেদাপাড়াসহ ১৭টি ইউনিয়নের ৩৬টি কমিউনিটি ক্লিনিকের অধিকাংশের চিত্র প্রায় একই রকম।[১৫৯] এ প্রসঙ্গে একটি বেসরকারি সংস্থা মোর্চা হেলথ নেটওয়ার্ক ১৮টি উপজেলার ৫৪টি ক্লিনিকের ওপর একটি জরিপ পরিচালনা করে বলেন, সেবাদানকারীদের অনুপস্থিতির কারণে অধিকাংশ ক্লিনিক ঠিকমতো পরিচালিত হচ্ছে না, এবং এই জরিপ পরিচালনার সময়[১৬০] অধিকাংশ ক্লিনিক বন্ধ ছিল বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।[১৬১]

বক্স ৫.১: কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবার মান
একটি কমিউনিটি ক্লিনিক (নাম প্রকাশ না করে) হতে সেবা নিতে আসা কয়েকজন রোগী সেবার মান এবং সেবাদাতার ব্যবহারে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তারা জানান, এই ক্লিনিকে দুই জন স্বাস্থ্যকর্মী থাকলেও তারা নিয়মিত আসেন না। কারণ, একজন স্বাস্থ্য সহকারীর ঐ গ্রামের বাজারে একটি ফার্মেসি রয়েছে, তিনি সেখানে এবং অন্য একটি ক্লিনিকে কাজ করেন। একজন রোগী উক্ত কমিউনিটি ক্লিনিকে পর পর তিনদিন যেয়েও তাকে পান নি বলে জানায়। তাছাড়া এই কমিউনিটি ক্লিনিকে নিয়োগপ্রাপ্ত কমিউনিটি হেলথ্ কেয়ার প্রোভাইডারও নিয়মিত আসেন না। তার সকাল সাড়ে আটটার মধ্যে আসার নিয়ম থাকলেও তিনি কখনও দশটার আগে আসেন না এবং দুপুর একটার পরে চলে যান। হেলথ্ কেয়ার প্রোভাইডারের কাছে ওষুধ চাইলে তিনি রুক্ষ ব্যবহার করেন। মুখ চিনে পরিচিত লোকদের ওষুধ দেন। আয়রন ও ক্যালসিয়াম টেবলেট শুধুমাত্র গর্ভবতী ও কিশোরীদের দেওয়ার নিয়ম থাকলেও পরিচিত নারীরা এসে এ ধরনের ওষুধ চাইলে তিনি দেন এবং খাতায় যেখানে গর্ভবতী ও কিশোরীদের নাম লেখার কথা সেখানে তাদের নাম লিখে রাখেন। **তথ্যসূত্র:** জামালপুর জেলার নরুন্দি ইউনিয়নে বসবাসরত একজন ব্যক্তির দেওয়া তথ্য (তারিখ: ১০/০৭/২০১৩)

[১৫৫] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৪।
[১৫৬] *প্রাগুক্ত*।
[১৫৭] *দৈনিক যুগান্তর*, ২৭ জানুয়ারি ২০১৪।
[১৫৮] ২০১৩ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওপর প্রকাশিত ফলো-আপ গবেষণা প্রতিবেদন থেকে প্রাপ্ত তথ্য।
[১৫৯] *দৈনিক দিনকাল*, ১১ অক্টোবর ২০১১।
[১৬০] জানুয়ারি থেকে অক্টোবর ২০১১।
[১৬১] বিস্তারিত জানতে দেখুন *দৈনিক প্রথম আলো*, ২ ডিসেম্বর ২০১১।

হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসা সেবা গ্রহণকারী রোগীকে ডাক্তারের ব্যক্তিগত চেম্বারে যাওয়ার পরামর্শ দেয় ডাক্তার, ডাক্তারের কক্ষের পিয়ন, দালাল এবং নার্স। তাছাড়া নির্দিষ্ট ডায়াগনস্টিক সেন্টারে যাওয়ারও পরামর্শ দেওয়া হয়। রিপোর্ট কার্ড জরিপ প্রতিবেদনে (২০১১, ২০১২, ২০১৩) দেখা যায়, ৫৭% সেবাগ্রহীতাকে নির্দিষ্ট ডায়াগনস্টিক সেন্টারে যাওয়ার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয় এবং এ হার সবচেয়ে বেশি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে (৭৮.৩%)।[১৬২]

৫.২.৩ নার্স ও ব্রাদারের সেবা এবং আয়াদের সেবা: টিআইবি পরিচালিত রিপোর্ট কার্ড জরিপ (২০১১, ২০১২, ২০১৩) এবং ডায়াগনস্টিক গবেষণা (২০১৩) অনুযায়ী হাসপাতালে নার্স ও ব্রাদারের সেবা প্রসঙ্গে চিকিৎসাসেবা গ্রহণকারী রোগীদের নিকট হতে জানা যায়, জরুরি মুহূর্তে নার্স ও ব্রাদারের প্রয়োজনে তাদেরকে ডেকে পেলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা পায় নি। নার্সদের ব্যবহার কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত মানের নয় বলেও তারা জানায়।

বক্স ৫.২: আয়া/নার্স/ওয়ার্ডবয়দের সেবা সম্পর্কিত একটি চিত্র

সাম্প্রতিক সময়ে এক রোগীর আত্মীয় তার রোগীকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে ভর্তি করান। সেখানে তিনি প্রায় ১০/১২ দিন অবস্থান করেন। উক্ত সময়ে তিনি এই ইউনিটের সেবার মান নিয়ে হতাশা ব্যক্ত করেন। তিনি জানান, আয়া ও নার্সদের বকশিশ না দিলে তারা রোগীর কাছে আসেন না। তাছাড়া ড্রেসিং করা, ট্রলি টানা প্রভৃতি কাজের জন্য ওয়ার্ডবয়দের অর্থ দিতে হয় যা নিয়ম বহির্ভূত। টাকা না দিলে অপারেশনের নির্ধারিত তারিখও পিছিয়ে দেন তারা। ইফতারের জন্যও তাদেরকে অর্থ দিতে হয়। তিনি বলেন, সেবা গ্রহণের প্রতিটি পর্যায়ে প্রতিদিন প্রতিটি কর্মচারীকে নিয়মিত অর্থ দিতে হয়। এই ইউনিট থেকে অর্থ ছাড়া কোনো সেবা পাওয়া যায় না ।

তথ্যসূত্র: ফেসবুকে একজন ভুক্তভোগীর অভিজ্ঞতা (২০/০৭/২০১৪)

হাসপাতালগুলোতে বাচ্চা প্রসব-পরবর্তী সময়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং অন্যান্য কাজের ক্ষেত্রে আয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রিপোর্ট কার্ড জরিপ প্রতিবেদন (২০১১, ২০১২, ২০১৩) হতে জানা যায়, আয়ারা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ওটি পরবর্তী সময়ে বকশিশ ব্যতীত রোগীর কোনো সেবা করে না। তাছাড়া আয়াদের আচরণও ইতিবাচক নয় বলে মন্তব্য করেন। নবজাতক শিশুকে তার অভিভাবকের নিকট হস্তান্তরের সময় আয়ারা বকশিশ বাবদ ২০০-৫০০ টাকা পর্যন্ত দাবি করে থাকে।

৫.২.৪ ডাক্তার দেখানোর ক্ষেত্রে সিরিয়াল ভঙ্গ: সরকারি হাসপাতালে ডাক্তার দেখানোর ক্ষেত্রে সিরিয়াল ভাঙ্গা একটি সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। ২০১২ সালের জাতীয় খানা জরিপে সেবাগ্রহণকারী খানার মধ্যে ১০.১% ডাক্তার দেখানোর ক্ষেত্রে সিরিয়াল ভঙ্গের কথা উল্লেখ করে। হাসপাতালের ধরনভেদে এ হার সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয় যথাক্রমে মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (১৭.২%), বিশেষায়িত হাসপাতাল (১৬.৯%) এবং জেনারেল/সদর হাসপাতালে (১০.৩%)।

৫.২.৫ শয্যা: হাসপাতালগুলোতে চাহিদার বিপরীতে শয্যা সংখ্যা কম হওয়ায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রোগীরা ভর্তির সাথে সাথে শয্যা পায় না। রিপোর্ট কার্ড জরিপ (২০১১, ২০১২, ২০১৩) অনুযায়ী কোনো কোনো ক্ষেত্রে রোগীরা হাসপাতালে ভর্তির সাথে সাথে শয্যা পায় না। এক্ষেত্রে একদিন বা তার চেয়ে বেশি সময় পর্যন্ত তাদেরকে মেঝেতে থাকতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে কোনো একটি রোগের (যেমন, ডায়রিয়া) প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে, হাসপাতালগুলোতে সেবাগ্রহণকারীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় রোগীকে মেঝেতে থাকতে হয়। আবার গাইনি রোগীর সংখ্যা বেশি হওয়ায় গাইনি ও প্রসূতি ওয়ার্ডের অনেক রোগীকে মেঝেতে থাকতে হয়। সাধারণ শয্যায় রোগীর চাপ বেশি থাকলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে পেয়িং শয্যাগুলো খালি থাকে।

হাসপাতালগুলোতে শয্যা স্বল্পতার সুযোগে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থের লেনদেন হয়। জাতীয় খানা জরিপে (২০১২) দেখা যায়, শয্যা বা কেবিন পাওয়ার জন্য ১০.৪% রোগীকে নিয়ম-বহির্ভূত (রশিদ ছাড়া) অর্থ দিতে হয়।

৫.২.৬ ওষুধ ও উপকরণ: টিআইবি'র বিভিন্ন গবেষণা ও জরিপে দেখা যায় বহির্বিভাগ, জরুরি বিভাগ ও অন্তর্বিভাগের রোগীদের একটি অংশ প্রেসক্রিপশনে লেখা ওষুধ পুরোপুরি পায় না। বিশেষ করে জরুরি বিভাগের রোগীদের প্রেসক্রিপশনে লেখা ওষুধের অধিকাংশ বাইরে থেকে কিনতে হয়। বহির্বিভাগের রোগীদের ওষুধ দেওয়া হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বল্প মূল্যের ওষুধ ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী দেওয়া হয়। অন্তর্বিভাগের রোগীদের বিশেষত প্রসূতি সেবা গ্রহণকারী রোগীদের বাইরে থেকে ওষুধ ও উপকরণ কিনতে হয় এবং ডেলিভারির জন্যে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে টাকা দিতে হয়।

[১৬২] ২৮টি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের ওপর (উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৩টি, জেলা সদর হাসপাতাল ২৩টি, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ২টি) ২৮টি রিপোর্ট কার্ড জরিপ প্রতিবেদনকে বিবেচনায় নেওয়া হয়।

৫.২.৭ বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা: হাসপাতালের ডাক্তার রোগীদের প্যাথলজি এবং রেডিওলজি সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য পরামর্শ দেয়। রোগীরা এ সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষা হাসপাতাল বা হাসপাতালের বাইরে থেকে করিয়ে থাকেন। তবে যারা হাসপাতাল হতে করান, তাদের অনেককে রশিদের বাইরে অতিরিক্ত টাকা দিতে হয়। এ সম্পর্কে জাতীয় খানা জরিপ (২০১২)-এ পাওয়া যায়, হাসপাতাল হতে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ১১.৪% খানাকে নিয়ম-বহির্ভূত (রশিদ ছাড়া) অর্থ দিতে হয়েছে।

৫.২.৮ পথ্যের মান: হাসপাতাল হতে সেবা গ্রহণকারী রোগীরা পথ্যের মান সম্পর্কে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। এ প্রসঙ্গে রিপোর্ট কার্ড জরিপ ২০১১, ২০১২, ২০১৩ অনুযায়ী দেখা যায়, ২৪.৬% সেবাগ্রহীতা হাসপাতালের পথ্যের মান খারাপ বলেন। এ হার সদর হাসপাতালে ১৭.৬%, মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৪০.০%, এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৫২.৯%। উত্তরদাতাদের নিকট থেকে পথ্যের মান খারাপ হওয়ার কারণ সম্পর্কে জানা যায়, খাবারের পরিবেশন নোংরা, খাবারের মধ্যে পাথর, বালি পাওয়া ইত্যাদি। এছাড়া অনেকক্ষেত্রে বাসি খাবার রোগীদের দেওয়া হয় বলেও জানা যায়।

৫.২.৯ ট্রলি সেবা: হাসপাতালের রোগীদের এক স্থান হতে অন্য স্থানে আনা-নেওয়ায় ট্রলির প্রয়োজন হয়। এই ট্রলি ব্যবহারেও রোগীদের নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে হয়। এ প্রসঙ্গে টিআইবি'র জাতীয় খানা জরিপ (২০১২) হতে পাওয়া যায়, দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হওয়া সেবাগ্রহণকারী খানাগুলোর ২০% কে ট্রলি ব্যবহারে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে।

৫.২.১০ ব্যান্ডেজ, ইনজেকশন, ও ড্রেসিং সেবা: হাসপাতালে ভর্তিরত রোগীদের অনেকে ব্যান্ডেজ, ইনজেকশন, ও ড্রেসিং সেবা পেতে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে টিআইবি'র জাতীয় খানা জরিপে (২০১২) পাওয়া যায়, দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হওয়া সেবাগ্রহণকারী খানাগুলোর ১৭.৩% কে ব্যান্ডেজ ও ড্রেসিং সেবা পেতে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে হয়েছে।

৫.২.১১ তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা: সরকারি হাসপাতালগুলোতে তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা রয়েছে। টিআইবি পরিচালিত রিপোর্ট কার্ড জরিপ (২০১১, ২০১২, ২০১৩)-এর আওতায় বিভিন্ন হাসপাতাল হতে সংগৃহীত তথ্যে জানা যায়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলোর মধ্যে কোনো কোনোটিতে তথ্য ও অনুসন্ধান কেন্দ্র নেই, অভিযোগ বাক্স নেই, কর্তব্যরত ডাক্তারদের তালিকা টানানো নেই, নাগরিক সনদ জনসম্মুখে টানানো নেই, এবং হাসপাতালগুলোতে বিভাগ/ইউনিট সম্পর্কিত চার্ট নেই।

অন্যদিকে রিপোর্ট কার্ড জরিপ প্রতিবেদন (২০১১, ২০১২, ২০১৩) হতে জানা যায়, নাগরিক সনদ সম্পর্কে বা হাসপাতাল সম্পর্কিত কোনো অভিযোগ বা পরামর্শ জানানোর স্থান সম্পর্কে সাধারণ জনগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবহিত নয়। আবার ডাক্তার কর্তৃক কোনো ধরনের অসদাচরণ অথবা চিকিৎসা ক্ষেত্রে কোনো গাফিলতির শিকার হলে রোগীদের করণীয় সম্পর্কে কোনো তথ্য হাসপাতালগুলোতে টানানো নেই। হাসপাতালগুলোতে কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তাও নেই। যেসব হাসপাতালে অভিযোগ বাক্স রয়েছে সেখানে কতটি অভিযোগ পড়ে এবং কিভাবে অভিযোগের নিষ্পত্তি করা হয় তা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া বা তথ্য প্রচার করা হয় না।

অন্যদিকে ঢাকায় নতুন সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের[১৬৩] কার্যক্রম শুরু হলেও প্রচারণার অভাবে অনেকেই এ সম্পর্কে জানেন না। এর ফলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালেই রোগীর চাপ বেশি থাকে।

৫.২.১২ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা: টিআইবি'র রিপোর্ট কার্ড জরিপ (২০১১, ২০১২, ২০১৩) এবং ডায়াগনস্টিক গবেষণা (২০১৩) হতে জানা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হাসপাতাল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা সম্ভব হয় না। রোগীদের ফ্লোরে অবস্থান এবং যত্রতত্র ময়লা ফেলার কারণে প্রায় সকল ওয়ার্ড অপরিচ্ছন্ন থাকে এবং দুর্গন্ধ ছড়ায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মেঝে পরিষ্কার করার জন্য জীবানুনাশক উপকরণ পর্যাপ্ত ব্যবহার করা হয় না। তাছাড়া হাসপাতাল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য প্রয়োজনীয় হারপিক ও স্যাভলনেরও অভাব রয়েছে। এমনকি বিছানার চাদর ও বালিশ নিয়মিত পরিষ্কার করা হয় না।

অনেকক্ষেত্রে শয্যার নীচে পরিষ্কার, শয্যার চাদর ও বালিশের কভার পরিষ্কার বা পরিবর্তন করাতে হলে আয়াদের টাকা দিতে হয়। কেবিনের কক্ষগুলো হাসপাতালের আয়ারা নিয়মিত পরিষ্কার করে না। এ প্রসঙ্গে জেলা সদর হাসপাতালে অবস্থানরত এক রোগী হাসপাতালে আটদিন অবস্থান কালে কেবিনের মেঝে ও টয়লেট পরিষ্কারের জন্য কোনো কর্মী আসে নি বলে জানায়।

---

[১৬৩] ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল ও ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট খিলগাঁও জেনারেল হাসপাতাল।

৫.২.১৩ দালালের সক্রিয় উপস্থিতি: টিআইবি'র জাতীয় খানা জরিপে (২০১২) দেখা যায়, দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হওয়া সেবাগ্রহণকারী খানাগুলোর ৬.২% হাসপাতালের ভেতরে দালাল দ্বারা হয়রানির শিকার হয়েছে। এ ধরনের হয়রানির শিকার হওয়ার হার সবচেয়ে বেশি (১৭.৩%) মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। হাসপাতালগুলোতে দালালদের কয়েকটি শ্রেণী রয়েছে, যেমন প্যাথলজি সেন্টারের প্রতিনিধি (পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট প্যাথলজিতে রোগী নিয়ে যায়), হাসপাতালের কর্মচারী এবং অস্থায়ী কর্মী (অভ্যন্তরে ভাল সেবার ব্যবস্থা করা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ইনজুরি সার্টিফিকেট এবং পোস্টমর্টেম রিপোর্ট, রোগীদের নিকট রক্ত বিক্রি করা ইত্যাদি), এবং বিভিন্ন মেডিকেল প্রতিনিধি (নির্ধারিত ফার্মেসিতে রোগী পাঠানো)।

টিআইবি'র বেজলাইন জরিপ হতে জানা যায়, দালালদের অনেকে স্থানীয়ভাবে প্রভাবশালী। তাদের নির্মূলে ডাক্তাররা একাধিকবার উদ্যোগ নিলেও সফল হয় নি, বরং দালালরাই ডাক্তারদের হুমকির মুখে রাখে। এমনকি জরুরি বিভাগে রোগীরা প্রবেশের পূর্বেই দালালরা রোগীদের প্রাইভেট ক্লিনিক বা ডায়াগনস্টিক সেন্টারে নিয়ে যায়।

৫.৩ প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম

সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে বিরাজমান অনিয়ম ও দুর্নীতি ছাড়াও রয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা যার কারণে এই হাসপাতালগুলো হতে রোগীরা যথাযথ সেবা পায় না। নিচে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা তুলে ধরা হল।

৫.৩.১ অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা: সংশ্লিষ্ট অংশীজন[১৬৪] হতে জানা যায়, হাসপাতালে ডাক্তারদের জন্য পর্যাপ্ত আবাসন সুবিধা নেই; যেগুলো আছে সবকটি বসবাসের জন্য উপযোগী নয়। উপজেলা পর্যায়ে ডাক্তারদের বসার জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় স্থাপনাও (কক্ষ, প্রয়োজনীয় আসবাব যেমন, চেয়ার-টেবিল, টয়লেট) নেই। জরুরি প্রয়োজনে চিকিৎসকদের যানবাহন সুবিধা নেই। তাছাড়া নার্স ও কর্মচারীদের জন্য আবাসন ব্যবস্থাও পর্যাপ্ত নয়।[১৬৫]

জেলা পর্যায়ের সদর হাসপাতালে রোগীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য অবকাঠামোগত সুবিধা পর্যাপ্ত নয়। এতে টেকনিশিয়ানদের সুষ্ঠুভাবে কাজ সম্পাদন করার ক্ষেত্রে সমস্যা হয়। এ প্রসঙ্গে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত এক সেমিনারে উপস্থাপিত প্রতিবেদন[১৬৬] হতে জানা যায়, ল্যাবে রক্তের টিসি, ডিসি, ইএসআর, হিমোগ্লোবিন, ব্লাড ইউরিয়া, সিরাম বিলুরুবিন ইত্যাদি পরীক্ষায় যে সকল যন্ত্রপাতি (হরমোন এনালাইজার, হেমাটোলজি এনালাইজার) ব্যবহার করা হয় তা পরিচালনায় অবকাঠামোগত সুবিধার অপর্যাপ্ততা রয়েছে যা টেকনিশিয়ানদের পরীক্ষা পরিচালনা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সমস্যা হয়।[১৬৭] এছাড়া জেলা সদর হাসপাতাল যেগুলো পুরাতন সেগুলোতে লিফট এর ব্যবস্থা নেই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সিসিইউ এবং আইসিইউ নেই।

৫.৩.২ ওষুধ সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা: হাসপাতালের জরুরি বিভাগ এবং বহির্বিভাগের জন্য পৃথকভাবে ওষুধের বরাদ্দ দেওয়া থাকে না। অন্তর্বিভাগের জন্য বরাদ্দপ্রাপ্ত ওষুধ হতে বহির্বিভাগ ও জরুরি বিভাগের রোগীদের ওষুধ সরবরাহ করা হয়। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নাগরিক সনদ অনুযায়ী উপজেলা, জেলা, এবং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসমূহের বিভিন্ন ওয়ার্ড/বিভাগে মজুদ ওষুধের তালিকা টানানোর কথা বলা হলেও টিআইবি'র রিপোর্ট কার্ড জরিপ (২০১১, ২০১২, ২০১৩)-এর আওতায় হাসপাতাল হতে সংগৃহীত তথ্যে পাওয়া যায়, এই তালিকা কোনো কোনো ক্ষেত্রে যেমন টানানো নেই, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে টানানো থাকলেও তা নিয়মিত হালনাগাদ করা হয় না। অন্যদিকে, অন্তর্বিভাগের রোগীর জন্য ইনডেন্ট অনুযায়ী স্টোর থেকে আনা ওষুধ ও চিকিৎসা সামগ্রী কিছু ক্ষেত্রে রোগীকে না দিয়ে আত্মসাৎ করা হয়। একটি জেলা সদর হাসপাতালে কর্মরত সংশ্লিষ্ট অংশীজন জানান, উক্ত প্রতিষ্ঠানের হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগ থেকে প্রতিদিনের ওষুধের কিছু অংশ আত্মসাৎ করা হয় এবং সেগুলো পরবর্তীতে জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন ক্লিনিকে বিক্রি করা হয়। টিআইবি'র (২০১৩) একটি গবেষণাতেও দেখা যায়, হাসপাতাল হতে ওষুধ[১৬৮] চুরি হয় এবং এসব ওষুধ হাসপাতালে ভর্তিরত রোগীদের কাছে বিক্রি করা হয়।

---

[১৬৪] স্বাস্থ্যসেবায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়: জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অভিজ্ঞতাভিত্তিক পরামর্শ সভা, ৩/০৭/২০১৩, টিআইবি।

[১৬৫] ২০১৩ সালের ৩ জুলাই টিআইবি জাতীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্য বিষয়ক একটি পরামর্শ সভার আয়োজন করে যেখানে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের (৪৫টি) প্রধান এবং জাতীয় পর্যায়ের নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন ব্যক্তিবর্গসহ সনাক এলাকার সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

[১৬৬] জাতীয় বাজেটে স্বাস্থ্যসেবা খাতের একটি পর্যালোচনা; জাতীয় সেমিনার, (স্বাস্থ্যসেবায় সামাজিক সমীক্ষা প্রতিবেদন: সাতক্ষীরা অঞ্চল); উবিনীগ, স্বাস্থ্য আন্দোলন, ২৪ নভেম্বর ২০১৩।

[১৬৭] *প্রাগুক্ত*।

[১৬৮] ক্যাপসুল ফ্লুকোজ ৫০০এমজি, ক্যাপসুল সিপরিড ৫০০এমজি, ক্যাপসুল এ্যামোক্সিসিলিন ২৫০এমজি, টেপ, ক্যানোলা, স্যালাইন (০.৯%), টেপ, ক্যানোলা, টিউব, রোগীর দেহে খাবার প্রবেশের পাইপ, সেলোরাইড ০.৯% ইত্যাদি।

৫.৩.৩ চিকিৎসা উপকরণ সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা: সংশ্লিষ্ট অংশীজন হতে জানা যায়, উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলোতে সবচেয়ে বড় সমস্যা হল এক্স-রে যন্ত্র সচল না থাকা। উপজেলা পর্যায়ে আলট্রাসনোগ্রাম, এক্স-রে ফিল্ম, ও ইসিজি যন্ত্রের অভাব রয়েছে। জেলা পর্যায়েও ডিজিটাল এক্স-রে যন্ত্র এবং ইকো-কার্ডিয়াক এবং চোখের পরীক্ষার জন্য মাইক্রোস্কোপ যন্ত্রের অভাব রয়েছে। এছাড়া অধিকাংশ জেলা সদর হাসপাতালে সিটি স্ক্যান যন্ত্র নেই।

এ প্রসঙ্গে রিপোর্ট কার্ড জরিপ হতে জানা যায়, জেলা সদর হাসপাতাল চাইল্ড ইনকিউবেটর, পোর্টেবল এক্স-রে এবং এন্ডোসকপি থাকার নিয়ম থাকলেও অনেকক্ষেত্রে এন্ডোসকপি যন্ত্র সকল হাসপাতালে নেই। অপারেশনের জন্য কোনো কোনো চিকিৎসা উপকরণ[১৬৯] রোগীকে বাইরে থেকে কিনতে হয়।

৫.৩.৪ অ্যাম্বুলেন্স সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত রিপোর্ট কার্ড জরিপ প্রতিবেদন হতে দেখা যায়, বিভিন্ন পর্যায়ের হাসপাতালগুলোতে একদিকে অ্যাম্বুলেন্সের স্বল্পতা রয়েছে, অন্যদিকে অনুমোদিত অ্যাম্বুলেন্সের সবগুলো সচল থাকে না। এসব প্রতিবেদন হতে দেখা যায়, অধিকাংশ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে একটি করে সচল অ্যাম্বুলেন্স রয়েছে। আবার অ্যাম্বুলেন্স সচল থাকলেও তার জন্য পর্যাপ্ত জ্বালানি বরাদ্দ নেই। অন্যদিকে জেলা সদর হাসপাতালগুলোতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুটি অ্যাম্বুলেন্স সচল রয়েছে।

অ্যাম্বুলেন্স স্বল্পতার কারণে হাসপাতালগুলোতে বিদ্যমান অ্যাম্বুলেন্সের ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি হয়। এই সুযোগে রোগীদের অ্যাম্বুলেন্স সেবা দেওয়ার বিনিময়ে অতিরিক্ত অর্থ নিয়ম-বহির্ভূতভাবে আদায় করা হয়। জাতীয় খানা জরিপে (২০১২) দেখা যায় অ্যাম্বুলেন্স সেবা গ্রহণকারীদের সর্বাধিক ৩২.৬% কে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে (রশিদ ছাড়া) অর্থ দিতে হয়েছে।

৫.৩.৫ ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধির উপস্থিতি: টিআইবি'র রিপোর্ট কার্ড জরিপ হতে জানা যায়, ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিদের হাসপাতালের অভ্যন্তরে প্রবেশে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ দিন[১৭০] ও সময়[১৭১] নির্দিষ্ট করে দিলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা মানা হয় না। টিআইবি'র জাতীয় খানা জরিপে (২০১২) দেখা যায়, দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হওয়া সেবাগ্রহণকারী খানার মধ্যে সর্বোচ্চ ১৫.২% ডাক্তার দেখানোর সময় কক্ষে ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধির উপস্থিতি ছিল বলে জানায়। জরিপে এ হার সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (২৩.৮%) ও জেনারেল/সদর হাসপাতালে (১৮.৭%)। রোগী দেখার সময়ে তারা হাসপাতালের বহির্বিভাগের ডাক্তারদের কক্ষে মাঝে মাঝে প্রবেশ করে, অনেকক্ষেত্রে রোগীদের জন্য নির্ধারিত জায়গা দখল করে বসে থাকে। জরুরি বিভাগের ভেতরেও তাদের সার্বক্ষণিক উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। রোগীর রোগ সংক্রান্ত গোপনীয়তা রক্ষা করা ডাক্তারের নৈতিক দায়িত্ব হলেও সেবা দেওয়ার সময় কক্ষে অন্য লোকের উপস্থিতিতে এই গোপনীয়তা রক্ষায় বাধা সৃষ্টি করে।

অন্যদিকে কিছু ক্ষেত্রে হাসপাতালের অভ্যন্তরে প্রবেশের নির্দিষ্ট সময়সীমা ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিদের মানতেও দেখা যায়। খুবই সীমিত সংখ্যক জেলা সদর হাসপাতালে ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিদের সংগঠন স্ব-উদ্যোগে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনাপূর্বক দিন ও সময় (সোম ও বুধবার দুপুর ১টার পর) নির্দিষ্ট করেন এবং এর বাইরে হাসপাতালের অভ্যন্তরে তারা প্রবেশ করেন না।

৫.৩.৬ চিকিৎসক ও কর্মচারীদের নির্ধারিত পোশাক/আইডি কার্ড ব্যবহার না করা: টিআইবি'র রিপোর্ট কার্ডসহ স্বাস্থ্য সম্পর্কিত অন্যান্য গবেষণায় দেখা যায়, সকল নার্স দায়িত্ব পালনকালে নির্ধারিত পোশাক পরিধান করলেও কর্মচারীরা (আয়া ও ওয়ার্ডবয়, দারোয়ান ও অন্যান্য চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী) নির্ধারিত পোশাক যেমন নিয়মিত পরিধান করে না, তেমনি কর্তব্যরত চিকিৎসকরাও কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের নির্ধারিত পোশাক পরিধান করে না। এছাড়া কর্মচারীরা আইডি কার্ড নিয়মিত গলায় ঝুলিয়ে রাখে না। হাসপাতালের কর্মচারী পরিচয় বহন করে এমন পোশাক পরিধান না করা বা আইডি কার্ড গলায় না ঝুলানোয় তাদের চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে রোগীদের সমস্যা হয়।

৫.৩.৭ হাসপাতালে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ/প্রভাব: টিআইবি'র রিপোর্ট কার্ডসহ স্বাস্থ্য সম্পর্কিত অন্যান্য প্রতিবেদনে দেখা যায়, হাসপাতালগুলোতে রাজনৈতিক বা প্রভাবশালীদের হস্তক্ষেপ/প্রভাব বিদ্যমান। বিশেষ করে, মারামারি করে আহত হয়ে আসা রোগীরা কেস করার জন্য তাদের পক্ষে মেডিকেল সার্টিফিকেট চায়, এবং এক্ষেত্রে অনেক সময় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বা তাদের

---

[১৬৯] ব্লেড, সিজার, প্লাস্টার, ক্যানোলা, সিরিঞ্জ, গ্লাভস্ ইত্যাদি।

[১৭০] কোনো কোনো ক্ষেত্রে সপ্তাহে রবি এবং বুধবার এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সোম ও বুধবার।

[১৭১] কোনো কোনো ক্ষেত্রে সকাল ৯.০টার পূর্বে, দুপুর ১২.০টা-২.৩০টা পর্যন্ত, দুপুর ১.০টা-২.৩০টা পর্যন্ত, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুপুর ১২টার পর, দুপুর ১.৩০টার পর, দুপুর ২.৩০টার পর।

প্রভাবশালী আত্মীয়-স্বজনরা চাপ দেয়। আবার অনেক রোগী প্রভাব খাটিয়ে হাসপাতালের পেয়িং শয্যায় বিনা পয়সায় থাকে। রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে হাসপাতালের কিছু কর্মচারী দায়িত্ব পালনে অবহেলা করলেও বদলি বা সামাজিকভাবে হেয় হওয়ার আশঙ্কায় এদের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে না।

৫.৩.৮ স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা নিয়মিত না হওয়া: হাসপাতালের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও চিকিৎসাসেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এক পরিপত্রের মাধ্যমে[১৭২] মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বিশেষায়িত হাসপাতাল, জেলা হাসপাতাল এবং উপজেলা হাসপাতালগুলোর ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করে। প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতে এই কমিটির প্রতিমাসে একবার সভায় মিলিত হওয়ার নিয়ম। তবে টিআইবি পরিচালিত গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত রিপোর্ট কার্ড জরিপ এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ সভা হতে জানা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা নিয়মিতভাবে হয় না। এর ফলে হাসপাতালগুলোর স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নে এই কমিটি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে না।

৫.৩.৯ হাসপাতালের নিরাপত্তা সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা: নিয়মানুযায়ী প্রতিটি হাসপাতালে সিকিউরিটি গার্ড থাকার কথা। তবে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত রিপোর্ট কার্ড জরিপ হতে জানা যায়, সিকিউরিটি গার্ড না থাকার কারণে রাতে হাসপাতালে চুরির ঘটনা ঘটে। কিছু ক্ষেত্রে হাসপাতালের বিভিন্ন ভবনের ছাদে মাদক সেবনের আসর বসে হাসপাতালের লাইট, ফ্যান, পানির ট্যাপসহ মূল্যবান জিনিসপত্রও চুরি হয়ে যায়।

৫.৩.১০ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত রিপোর্ট কার্ড জরিপ প্রতিবেদন হতে জানা যায়, হাসপাতালের বর্জ্য ফেলার জন্য অত্যাধুনিক ব্যবস্থা অধিকাংশ হাসপাতালে নেই। ফলে যেখানে-সেখানে ইনজেকশন ও ওষুধের খালি বোতল, সিরিঞ্জ, সূঁচ, স্যালাইনের খালি প্যাকেট, নল, বিস্কুট-চিপস-এর খালি প্যাকেট, কলার খোসা ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের আবর্জনা পড়ে থাকে, যা দুর্গন্ধ তৈরির পাশাপাশি মশা-মাছির উপদ্রব বাড়াচ্ছে, সর্বোপরি পরিবেশ দূষণ হচ্ছে।

৫.৩.১১ স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে সুষ্ঠু চিকিৎসার পরিবেশ ব্যাহত: হাসপাতালে ভর্তিরত রোগীর মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে রোগীর সাথে চিকিৎসক এবং কর্মচারীদের মারামারি, স্থানীয় প্রভাবশালীর সাথে চিকিৎসকদের বিভিন্ন বিষয়ে বাক-বিতণ্ডা, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রতিবেদন সংগ্রহের সময় গণমাধ্যম কর্মীদের ওপর চিকিৎসকদের হামলা এবং পরবর্তীতে মারামারি[১৭৩] প্রভৃতি ধরনের ঘটনায় স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে চিকিৎসাসেবার স্বাভাবিক কার্যক্রমে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন হাসপাতালে সংঘটিত এ ধরনের ঘটনার একটি চিত্র পরিশিষ্ট ৬-এ দেওয়া হল।

৫.৩.১২ জরুরি প্রয়োজনে অর্থ ব্যয়ের অনুমোদন না থাকা: টিআইবি'র রিপোর্ট কার্ড জরিপ এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজন হতে জানা যায়, হাসপাতালের বিভিন্ন যন্ত্র মেরামতে যেমন, চিকিৎসা যন্ত্রপাতি, গাড়ি, অ্যাম্বুলেন্স প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ত্বরিৎ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্থানীয়ভাবে অর্থ ব্যয়ের অনুমোদন দেওয়া হয় না। তাছাড়া হাসপাতালের রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য জরুরি প্রয়োজনে উক্ত অর্থ খরচ করার ক্ষমতা/সিদ্ধান্ত সিভিল সার্জনের নেই। তাছাড়া হাসপাতালের লাইট, ফ্যান, সুইচ ইত্যাদি মেরামতের ক্ষমতা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নেই। লাইট, ফ্যান, সুইচ ইত্যাদি নষ্ট হলে গণপূর্ত বিভাগের মাধ্যমে মেরামত করা হয়। এ প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট অংশীজন জানান, গণপূর্ত অধিদপ্তর থেকে মেরামতে অনেকক্ষেত্রেই কয়েক মাস লেগে যায় এবং এর কারণ হিসেবে প্রায়ই বলা হয় যে, তাদের ফান্ডের সীমাবদ্ধতা রয়েছে; যা রোগীদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে বিঘ্ন ঘটায়।

৫.৪ উপসংহার

গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফলের আলোকে বলা যায়, সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান হতে চিকিৎসা সেবা নিতে এসে রোগীরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সঠিক ও সুষ্ঠু সেবা যেমন পান না, তেমনি বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হন। এর পিছনে রয়েছে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা, জনবল, ওষুধ ও চিকিৎসা উপকরণের সীমাবদ্ধতা, আর্থিক সীমাবদ্ধতা, জবাবদিহিতায় ঘাটতি, ও তথ্য ব্যবস্থাপনায় ঘাটতি। এই সকল কারণে হাসপাতাল প্রদত্ত বিভিন্ন ধরনের সেবা পেতে রোগীদের নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে হয়।

---

[১৭২] নং স্বাপকম/হাস-২/তদারকি কমিটি-১/২০০৭/৯৯৮।

[১৭৩] *বাংলা নিউজ টোয়েন্টিফোর*, ১০/১১/২০১৩ ।

অধ্যায় ছয়

বেসরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা: সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম

৬.১ ভূমিকা

বেসরকারি খাতে চিকিৎসাসেবাকে উৎসাহিত করতে সরকার বেসরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি দেয়। এ লক্ষ্যে সরকার বেসরকারি চিকিৎসাসেবা সংক্রান্ত 'দি মেডিকেল প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্রাইভেট ক্লিনিক অ্যান্ড ল্যাবরেটরিজ (রেগুলেশন/রেজিস্ট্রেশন) অর্ডিন্যান্স, ১৯৮২' জারি করে।[১৭৪] বেসরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য আইন কাঠামো প্রণয়ন ও সরকারের সদিচ্ছা থাকায় এ ধরনের প্রতিষ্ঠান অধিক সংখ্যক হারে গড়ে উঠছে। আর এ উদ্যোগে এগিয়ে এসেছে কর্পোরেট ব্যবসায়ী, বিশেষজ্ঞ ডাক্তার (সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে) ও চিকিৎসক নেতা। দেশে নিবন্ধিত বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিক রয়েছে ২,৯৮৩টি এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টার রয়েছে ৫,২২০টি।[১৭৫]

বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ক্ষেত্রে আবশ্যকীয় শর্তগুলো হল রোগীর জন্য স্বাস্থ্যকর পরিবেশসহ পর্যাপ্ত জায়গা, প্রতি রোগীর জন্য কমপক্ষে ৮০ বর্গফুট জায়গা, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অপারেশন থিয়েটার, অপারেশনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি, ওষুধের পর্যাপ্ত সরবরাহ, প্রতি দশ শয্যার জন্য একজন সার্বক্ষণিক রেজিস্টার্ড মেডিকেল চিকিৎসক, দুইজন নার্স এবং একজন সুইপার, এবং ভর্তিরত রোগীর সার্জারি, চিকিৎসা এবং সুপারভিশনের জন্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তার। অন্তর্বিভাগ, বহির্বিভাগ, জরুরি বিভাগ, ওয়াশ কক্ষ, লেবার কক্ষ, অপেক্ষা কক্ষ, অফিস কক্ষ, অস্ত্রোপচার কক্ষের সুবিধাসহ রোগীদের ডাক্তারী পরামর্শ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পথ্য ও শয্যা সুবিধা, প্রসূতি সেবা প্রভৃতি ধরনের সেবা দেওয়ার সক্ষমতা থাকতে হবে। তবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছ থেকে জানা যায়, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জনবল ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ কোন কোন পদবীর কত সংখ্যক ডাক্তার, নার্স, টেকনোলজিস্ট এবং অন্যান্য ব্যক্তি দ্বারা এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালিত হচ্ছে এর কোনো পরিসংখ্যান নেই।

বেসরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন ও তদারকিতে রয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হাসপাতাল ও ক্লিনিক শাখা থেকে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন নিতে হয়। নির্ধারিত ফরম পূরণ পূর্বক পরিদর্শন টীমের সন্তোষজনক প্রতিবেদনের ভিত্তিতে অনুমোদন দেওয়া হয়। তাছাড়া এ সকল প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে রয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং মোবাইল কোর্ট। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়ম (পরিচ্ছন্ন পরিবেশ থাকা, অভিজ্ঞ টেশনিশিয়ান, ডিউটি ডাক্তার ও ডিপ্লোমা ডাক্তার ও নার্স থাকা, বৈধ লাইসেন্স থাকা ইত্যাদি) ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলোতে প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা তা যাচাইয়ে মোবাইল কোর্ট কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় এবং এর লঙ্ঘনজনিত কারণে জরিমানা করা হয়। মোবাইল কোর্টের যাবতীয় কার্যক্রম মোবাইল কোর্ট অধ্যাদেশ, ২০০৯ অনুযায়ী পরিচালিত হয়। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় সহায়তা দিয়ে থাকে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে অডিটিং (নিরীক্ষা) ব্যবস্থা নেই।

৬.২ বেসরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি

৬.২.১ অনুমোদনের প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পূরণ না করা: বেসরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের মান নিয়ন্ত্রণপূর্বক সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হাসপাতাল ও ক্লিনিক শাখা থেকে অনুমোদন নিতে হয়। কিন্তু দেখা যায়, অনুমোদন পাওয়ার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ সকল প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় সংখ্যক চিকিৎসক ও নার্সের উপস্থিতি, চিকিৎসা যন্ত্রপাতির সহজলভ্যতা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পূরণ করলেও পরবর্তীতে তা আর রক্ষা করে না। এক প্রতিবেদন হতে জানা যায়, ঢাকায় ৫২৯টি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৫০০ টিতে নীতিমালা অনুযায়ী চিকিৎসা উপকরণ নেই।[১৭৬]

নিবন্ধনকৃত বেসরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলোর মান নির্ভর করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অপারেশন থিয়েটার, অপারেশন থিয়েটার সংশ্লিষ্ট অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি, জীবন-রক্ষাকারী ও অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের পর্যাপ্ত সরবরাহ, ডাক্তারের

---

[১৭৪] পরবর্তীতে অর্ডিন্যান্সে কয়েকটি বিষয়ে সংশোধনী আনা হয় যা দি মেডিকেল প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্রাইভেট ক্লিনিকস্ অ্যান্ড ল্যাবরেটরিজ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অর্ডিনেন্স-১৯৮৪ নামে অভিহিত।

[১৭৫] স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, *স্বাস্থ্য বুলেটিন* ২০১৩।

[১৭৬] *বাংলাদেশ নিউজ ২৪. কম*, ৪ অক্টোবর ২০১৪।

অভিজ্ঞতা, টেকনোলজিস্টদের অভিজ্ঞতা ইত্যাদির ওপর। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই সকল শর্তাবলী অমান্য করে কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

অর্ডিন্যান্স[১৭৭] অনুযায়ী রোগীর অপারেশন, চিকিৎসা এবং তত্ত্বাবধানের জন্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কথা বলা হলেও অনেক বেসরকারি ক্লিনিক অনেকক্ষেত্রে এটি মেনে চলে না। অনেকক্ষেত্রে হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলোতে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের বিজনেস কার্ড রাখা হলেও তাদের অনেকেই সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে প্র্যাকটিস করেন না। অর্ডিন্যান্সে[১৭৮] প্রতি দশ শয্যার জন্য একজন সার্বক্ষণিক নিবন্ধিত মেডিকেল চিকিৎসক, দুইজন নার্স এবং একজন সুইপার থাকার নিয়ম থাকলেও অধিকাংশ বেসরকারি ক্লিনিকে তা মানা হয় না। এ প্রসঙ্গে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, অধিকাংশ বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক চিকিৎসক, ডিপ্লোমাধারী নার্স, মেডিকেল টেকনোলজিস্ট, এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নেই। এমনকি মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের কাজগুলো করছে ল্যাব অ্যাটেন্ডডেন্টরা।[১৭৯] জেলা পর্যায়ের একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসক জানান, আমার প্রতিষ্ঠানে কোনো যোগ্যতাসম্পন্ন টেকনিশিয়ান নেই। তবে প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ যদি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পরিদর্শনের তারিখ আগেই জানতে পারে, সেক্ষেত্রে একমাসের জন্য একজন যোগ্যতাসম্পন্ন টেকনিশিয়ান নিয়োগ দেওয়া হয়।

৬.২.২ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের দুর্বল তদারকি: বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলো কিভাবে চলছে, চিকিৎসাসেবার মান কেমন, কী ধরনের যন্ত্র ব্যবহার করছে, অর্ডিন্যান্সের শর্তাবলী পূরণ করছে কি না প্রভৃতি বিষয়গুলোতে তদারকি কার্যক্রম পরিচালনা দু'ভাবে হয়ে থাকে। একটি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হাসপাতাল ও ক্লিনিক শাখা থেকে, অন্যটি সিভিল সার্জন কর্তৃক। এ প্রসঙ্গে জানা যায়, পর্যাপ্ত জনবলের অভাবে এ প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়মিতভাবে তদারকি কার্যক্রম পরিচালিত হয় না। বর্তমানে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হাসপাতাল ও ক্লিনিক শাখায় তদারকি ব্যবস্থাপনায় কর্মকর্তা রয়েছেন ছয়জন।[১৮০] এদেরকে ঢাকাসহ সারাদেশের নিবন্ধিত প্রায় আট হাজারের অধিক বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকের তদারকি কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়, যা তাদের পক্ষে করা অসম্ভব। জেলা পর্যায়ে সিভিল সার্জনও তদারকির দায়িত্বে রয়েছে। সিভিল সার্জনও বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ব্যস্ততার কারণে নিয়মিত তদারকি কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে না। একজন সিভিল সার্জনকে একাধারে সিভিল সার্জন কার্যালয়, জেলা সদর হাসপাতাল, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র, কমিউনিটি ক্লিনিক কার্যক্রম তদারকিসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। এর ফলে বেসরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলোর তদারকি নিয়মিত ও যথাযথ নয়।

বক্স ৬.১: বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের তদারকি কার্যক্রম
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মনীতি না মেনে ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও ক্লিনিক পরিচালনা করার দায়ে তিনটি বেসরকারি ডায়াগনস্টিক সেন্টার সিলগালা করে দিয়েছে ভ্রাম্যমান আদালত। এ সময় একই আদালত আরও তিনটি প্রাইভেট ক্লিনিকে অভিযান চালিয়ে ২ লাখ ২৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করে । ভ্রাম্যমান আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট (উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা) এ অভিযান পরিচালনা করেন। সিঙ্গাইর সরকারি হাসপাতালের সামনে এবং পৌর এলাকার সড়কের বিভিন্ন স্থানে হাসপাতালের ডাক্তার, কর্মচারী ও স্থানীয় প্রভাবশালীরা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়ম না মেনে বেশ কয়েকটি ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার স্থাপন করে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসা করে আসছে। ভ্রাম্যমান আদালত অভিযান চালিয়ে রওশানারা ডায়াগনস্টিক সেন্টার, কেয়ার ডায়াগনস্টিক সেন্টার, সিঙ্গাইর প্যাথলজি অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার সিলগালা করে দেয়। তাছাড়া একই আদালত 'ক্লিনিক অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার'কে ৭০ হাজার টাকা, 'হেলথ সিটি ক্লিনিক অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার'কে ৭৫ হাজার ও 'আজিজ জেনারেল হাসপাতাল'কে ৮০ হাজার টাকা জরিমানা করে। **তথ্যসূত্র:** *দৈনিক যায় যায় দিন*, ২১ এপ্রিল ২০১৩

৬.২.৩ বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের তদারকি কার্যক্রম পরিচালনায় নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়: বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের তদারকি কার্যক্রম ব্যবস্থাপনায় নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের লেনদেন হয়। এ প্রসঙ্গে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রাক্তন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত চিকিৎসক ও টেকনিশিয়ান, এবং সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে পণ্য সরবরাহকারী ঠিকাদার হতে জানা যায়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়মিত তদারকি কার্যক্রম পরিচালনা না করে সিভিল সার্জন মাসিক ভিত্তিতে মাসোহারা নিয়ে থাকে - প্রতিষ্ঠানভেদে এর পরিমাণ ১০ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকা। আবার মোবাইল কোর্ট অভিযানে কোনো প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম পাওয়া গেলে সেই প্রতিষ্ঠান হতে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ের পরিমাণ বেড়ে ২০ হাজার থেকে এক লাখ টাকা পর্যন্ত হয়। তাছাড়া বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন দিতেও ঘুষ লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে।

[১৭৭] অর্ডিন্যান্স ১৯৮২ এর ৯ নং ধারা।
[১৭৮] অর্ডিন্যান্স ১৯৮২ এর ৯ নং ধারা।
[১৭৯] deshinewsbd.com, ৪ অক্টোবর, ২০১৪।
[১৮০] চারজন সহকারী পরিচালক ও দুইজন উপ-পরিচালক।

৬.২.৪ পরামর্শ ফি'র সামঞ্জস্যতা না থাকা: বেসরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত নিবন্ধনকৃত ডাক্তারদের রোগীদের নিকট থেকে পরামর্শ ফি আদায়ের কোনো নির্দিষ্ট মানদণ্ড নেই। এর ফলে পরামর্শ ফি আদায়ের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অসামঞ্জস্যতা লক্ষ করা যায়। এ প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট অংশীজন জানান, চিকিৎসকদের ডিগ্রি, পদবি, দক্ষতা, চিকিৎসাসেবা দেওয়ার স্থান, চেম্বারের সাজসজ্জা প্রভৃতির ওপর ভিত্তি করে পরামর্শ ফি ১০০ টাকা হতে ১,৫০০ টাকা পর্যন্ত আদায় করা হয়।[১৮১]

৬.২.৫ ডায়াগনস্টিক পরীক্ষার মূল্যের সামঞ্জস্যতা না থাকা: বেসরকারি হাসপাতাল/ক্লিনিক/ডায়াগনস্টিক সেন্টার ভেদে পরীক্ষার ফি'র উল্লেখযোগ্য তারতম্য রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ক্রিয়েটিনিন পরীক্ষা ডায়াগনস্টিক সেন্টারভেদে ৩৫০ থেকে ৫২০ টাকা, আলট্রাসনোগ্রাম (হোল অ্যাবডোমেন) ৬০০ থেকে ১,৮০০ টাকা, কোলেস্টোরেল ২৫০ থেকে ৪৫০ টাকা, সিরাম ইলেক্ট্রোলাইট ৩০০ থেকে ১,০০০ টাকা, সিবিসি ৩৫০ থেকে ৫৫০ টাকা এবং মূত্র পরীক্ষা ১৫০ থেকে ৩৫০ টাকা। সংশ্লিষ্ট অংশীজনরা জানান, বেসরকারি প্রত্যেকটি পরীক্ষায় রোগীর নিকট হতে প্রকৃত খরচ অপেক্ষা অতিরিক্ত মূল্য নেওয়া হচ্ছে।[১৮২] এ প্রসঙ্গে স্বাস্থ্যমন্ত্রী 'ডিজাস্টার হেলথ ম্যানেজমেন্ট এণ্ড ইমারজেন্সি রেসপণ্ড ফ্রেমওয়ার্ক' শীর্ষক কর্মশালায় বলেন, ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলোতে প্রয়োজনীয় খরচের তুলনায় অনেক গুন চার্জ নেওয়া হয়।[১৮৩] রোগীদের নিকট হতে অতিরিক্ত মূল্য নেওয়ার কারণ হিসেবে জানা যায়, ডাক্তার প্রতি কমিশনের হার, প্রতিষ্ঠানের স্থান ও ধরন, প্রতিষ্ঠানের জন্য সরবরাহ ক্রয়কৃত যন্ত্রের মান প্রভৃতি।

৬.২.৬ পরামর্শ ফি'র রশিদ রোগীকে সরবরাহ না করা: অর্ডিন্যান্সে[১৮৪] বেসরকারি চিকিৎসাসেবায় ডাক্তার কর্তৃক রোগীর পরামর্শ ফি'র রশিদ রোগীকে দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। কিন্তু পর্যবেক্ষণ এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজন হতে জানা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটি মানা হয় না।

৬.২.৭ রোগীর ঠিকানা নিবন্ধন না করা: অর্ডিন্যান্সে[১৮৫] পরামর্শ গ্রহণকারী ব্যক্তির নাম এবং ঠিকানা নিবন্ধনকরণ সম্পর্কে বলা হলেও অধিকাংশ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নাম লিপিবদ্ধ করা হলেও ঠিকানা নিবন্ধন করা হয় না।

৬.২.৮ ভুয়া এবং অতিরিক্ত পেশাগত যোগ্যতা ব্যবহার: আইন অনুযায়ী নিবন্ধনকৃত কোনো মেডিকেল বা ডেন্টাল চিকিৎসক এমন কোনো নাম, পদবি, বিবরণ বা প্রতীক এমনভাবে ব্যবহার বা প্রকাশ করতে পারবেন না যার ফলে তার কোনো অতিরিক্ত পেশাগত যোগ্যতা আছে বলে কেউ মনে করতে পারেন।[১৮৬] এ প্রসঙ্গে চিকিৎসক সংগঠনের সাথে জড়িত প্রতিনিধিরা জানান, কিছু চিকিৎসক স্বীকৃত পোস্ট গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি অর্জন না করেও নিজেদের 'মেডিসিন বিশেষজ্ঞ', 'সার্জারি বিশেষজ্ঞ', 'চর্ম ও যৌন রোগ বিশেষজ্ঞ', 'গাইনি ও প্রসূতি বিশেষজ্ঞ' ইত্যাদি উপাধি ব্যবহার করছেন। আবার অনেকে এফসিপিএস (পার্ট-১), (পার্ট-২), এমডি (ইন কোর্স), (শেষ পর্ব) ইত্যাদি ব্যবহার করছেন, যেগুলো প্রকৃত অর্থে কোনো যোগ্যতা বা পূর্ণাঙ্গ ডিগ্রি নয়। চিকিৎসকদের অতিরিক্ত পেশাগত যোগ্যতা ব্যবহার না করার জন্য বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিলের ওয়েবসাইটে সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তিও দেওয়া হয়েছে।[১৮৭]

অন্যদিকে, ভুয়া ডিগ্রি ব্যবহার করে চিকিৎসা চর্চা করার কথা জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট অংশীজনরা। এক প্রতিবেদন হতে জানা যায়, দীর্ঘ ৮-১০ বছর ধরে ভুয়া বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের নাম ব্যবহার করে চিকিৎসাসেবা দেওয়া হচ্ছে। ফলে রোগীর রোগ নিরাময় না হয়ে রোগীর নানা ধরনের স্বাস্থ্যগত জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে। এমনকি অনেকক্ষেত্রে রোগীর মৃত্যুর ঝুঁকি সৃষ্টি হচ্ছে।[১৮৮] কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে, ডাক্তার নন এমন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারাও রোগীর চিকিৎসা করা হচ্ছে। তাছাড়া কিছু ক্ষেত্রে চিকিৎসকের সহযোগীরা প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে নিজেদের ডিগ্রিধারী বিশেষজ্ঞ পরিচয় দিয়ে রোগীদের চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম চালাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে জেলা পর্যায়ের একটি বেসরকারি ক্লিনিকের টেকনিশিয়ান বলেন, "আমার ক্লিনিকের ম্যানেজার ডাক্তার না হয়েও ক্লিনিকে আগত রোগীদের চিকিৎসা করেন।" এছাড়া তিনি আরও বলেন, "ঐ ক্লিনিকে অনেক সময় বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ছাড়াই রোগীর অপারেশন করানো হয়েছে।" এক প্রতিবেদন হতে জানা যায়, একটি বেসরকারি ক্লিনিকে প্রসূতিকে স্থানীয় পল্লী চিকিৎসকের পরামর্শে ভর্তি করানো হয় এবং ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়াই ক্লিনিকের ম্যানেজার ও নার্স প্রসূতির অস্ত্রোপচার করলে নবজাতক ও প্রসূতির মৃত্যু হয়।[১৮৯]

---

[১৮১] বিভিন্ন পর্যায়ের ডাক্তারদের পরামর্শ ফি'র জন্য দেখুন পরিশিষ্ট ৭।

[১৮২] *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪।

[১৮৩] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪।

[১৮৪] অর্ডিন্যান্স ১৯৮২ এর ধারা ৬ (২) অনুযায়ী।

[১৮৫] অর্ডিন্যান্স ১৯৮২ এর ৬ (১) ধারায়।

[১৮৬] *বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আইন*, ধারা ২৯।

[১৮৭] ১৭ এপ্রিল ২০১৪; বিস্তারিত জানতে দেখুন, www.bmdc.org.bd (accessed on 18 July 2014)

[১৮৮] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৩।

[১৮৯] বিস্তারিত জানতে দেখুন *দৈনিক ইনকিলাব*, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৪।

৬.২.৯ কমিশনভিত্তিক চুক্তি: বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হওয়ার কারণে প্রতিষ্ঠানগুলোতে রোগী এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার সংখ্যা যত বেশি হয়, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠাতারা তত বেশি লাভবান হয়। এ কারণে প্রতিষ্ঠানগুলো ডাক্তার এবং দালালদের সাথে কমিশনের ভিত্তিতে সম্পর্ক তৈরি করে, যেন তারা বেশি পরিমাণে রোগী পাঠান। এ প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকরা জানান, এ কমিশনের হার ৩০% থেকে ৫০% পর্যন্ত হয়।

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অধ্যাপক মর্যাদার চিকিৎসক, এবং সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ হতে জানা যায়, অপারেশন এবং ডায়াগনস্টিক পরীক্ষার সংখ্যা বেশি হলে প্রতিষ্ঠানের মালিকপক্ষ বেশি লাভবান হয়। এ কারণে তারা অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনে ডাক্তারদের নির্দেশনা দিয়ে থাকে। যদি কোনো ডাক্তার পর্যাপ্ত মুনাফা অর্জনে সহায়তা করতে না পারে, তবে তাকে ঐ হাসপাতাল বা ক্লিনিকে প্র্যাকটিস করতে দেওয়া হয় না। অন্যদিকে, ডায়াগনস্টিক সেন্টারের সাথে অনেক সময় একই এলাকায় অবস্থিত হাসপাতাল ও ক্লিনিকের জনপ্রিয় চিকিৎসকদের (যারা অধিক সংখ্যক রোগী দেখার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন) সাথে অলিখিত সমঝোতা থাকে। এসব ডায়াগনস্টিক সেন্টার তাদের প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষা-নিরীক্ষার নামের তালিকা ছেপে সে সব ডাক্তারদের দেয়। অন্যদিকে, ডাক্তারদের সাথে বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানির মেডিকেল প্রতিনিধিদের একটি অলিখিত কমিশন চুক্তি অনুযায়ী ডাক্তাররা ওষুধ প্রেসক্রাইব করে, বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে কমিশন পায়।

দালালদের সাথে বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের অলিখিত কমিশন চুক্তি থাকে। এক্ষেত্রে দালালরা নানা কৌশলে সরকারি হাসপাতাল হতে রোগীদের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নিয়ে যায়। বিনিময়ে তারা বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ১০% থেকে ৩০% পর্যন্ত কমিশন পেয়ে থাকে। যেসব স্থানে ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার বেশি, সেসব জায়গায় প্রতিযোগিতা বেশি থাকায় রোগীর সংখ্যার ওপর নির্ভর করে দালালদের কমিশন।

৬.৩ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসাসেবার গ্রহণযোগ্যতা

৬.৩.১ চিকিৎসাসেবার অত্যধিক ব্যয়: আইনের প্রয়োগ এবং যথাযথ তদারকির ঘাটতিতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসাসেবার ব্যয় নির্ধারিত হয় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের নিজস্ব বিবেচনায়। এই কারণে দেখা যায়, একই সেবার জন্য প্রতিষ্ঠানভেদে চিকিৎসা ব্যয়ের তারতম্য অনেক বেশি। বেসরকারি চিকিৎসাসেবায় পরামর্শ ফি, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পথ্যের মূল্য এবং কেবিন ভাড়ায় উচ্চহার রয়েছে। এছাড়া ডাক্তার ও দালালদের সাথে কমিশনভিত্তিক চুক্তির কারণে রোগীদের এমন পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রেসক্রাইব করা হয় যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত কি না তা নিয়ে প্রশ্নের উদ্রেক হয়।

৬.৩.২ মুনাফা-কেন্দ্রিক মানসিকতা: কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিম্নমানের চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হলেও অর্থের ব্যাপারে রোগীকে ছাড় দেওয়া হয় না। যেমন, কিছু বেসরকারি হাসপাতাল বা ক্লিনিকে একদিকে যেমন আধুনিক যন্ত্রপাতি নেই, অন্যদিকে যন্ত্রপাতি থাকলেও অনেকক্ষেত্রে সেগুলো পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষিত ও যোগ্যতাসম্পন্ন টেকনিশিয়ান নেই। অভিজ্ঞতা নেই বা কম অভিজ্ঞতাসম্পন্নদের কয়েক সপ্তাহ প্রশিক্ষণ দিয়ে যন্ত্র পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। অনেকক্ষেত্রে প্যাথলজিস্ট না রেখে তাদের সিল ব্যবহার করে বিভিন্ন পরীক্ষার প্রতিবেদন তৈরি করে রোগীদের রিপোর্ট প্রদান করা হয়। এ প্রসঙ্গে এক প্রতিবেদন হতে জানা যায়, এক্স-রে করার কাজ পিয়ন দিয়ে চালানো হচ্ছে।[১৯০]

আবার অনেকক্ষেত্রে প্রয়োজনের চেয়ে রোগীদের বেশিদিন হাসপাতালে রাখা হয় বলে প্রায়ই অভিযোগ ওঠে। এক প্রতিবেদন হতে জানা যায়, রোগীর মৃত্যুর তথ্য গোপন রেখে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ রোগীকে আইসিইউতে এক সপ্তাহ লাইফ সাপোর্ট দিয়ে রাখে এবং উচ্চহারে বিল তৈরি করে।[১৯১] তাছাড়া বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মুনাফা প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট অংশীজনরা জানান, কোনো কোনো ক্ষেত্রে মুনাফা লাভে রোগীদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রদান করা হয়ে থাকে।

৬.৪ উপসংহার

এ অধ্যায়ের আলোচনায় দেখা যায় বেসরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট আইন অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা তা নিয়ে তদারকির ঘাটতি/ দুর্বলতা রয়েছে। ফলে বেসরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতায় ঘাটতি, স্বাস্থ্যসেবার মান নিয়ন্ত্রণ না হওয়া, জনগণের সামর্থ্যের বাইরে চিকিৎসাসেবার ব্যয় চলে যাওয়া, এবং মানসম্পন্ন চিকিৎসাসেবা না পাওয়ার প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে। তাছাড়া অতিরিক্ত ফি, অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ডাক্তার না হয়েও ভুয়া পদবী ব্যবহার করে চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে রোগী মৃত্যুর ঝুঁকি সৃষ্টি হয় এবং রোগীদের আর্থিক ক্ষতি হয়।

---

[১৯০] বিস্তারিত জানতে দেখুন *দৈনিক ভোরের কাগজ*, ২৯ এপ্রিল ২০০৬।

[১৯১] *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ১৯ আগস্ট ২০১৪।

অধ্যায় সাত

উপসংহার ও সুপারিশ

৭.১ উপসংহার

সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো যথেষ্ঠ মাত্রায় সেবামুখী না হওয়ায় এবং সেগুলোতে সুশাসনের সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ থাকায় তারা জনগণকে কাঙ্ক্ষিত স্বাস্থ্যসেবা দিতে পাচ্ছে না। এতে একদিকে যেমন মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগ তৈরি হচ্ছে, অন্যদিকে স্বাস্থ্যসেবা প্রত্যাশীরা নিয়মিত বঞ্চিত হচ্ছে।

স্বাস্থ্য খাতে বিরাজমান সমস্যার কারণ বিশ্লেষণে আমরা দেখতে পাই, এ খাতের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক ও অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা এবং কার্যপরিচালনার ক্ষেত্রে নানা ধরনের অনিয়ম এবং দুর্নীতি রয়েছে। সরকার সকলের জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে কিছু কর্মকৌশল নির্ধারণ করলেও এ সকল কর্মকৌশলের কিছু কিছু কৌশল বাস্তবায়নের যুগোপযোগী আইন/ বিধিমালা তৈরিতে উদ্যোগ নেই। যেমন, স্বাস্থ্যসেবার সাথে সম্পৃক্ত সকলের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য নীতিমালা বা আইন প্রণয়নের ঘাটতি রয়েছে। সকল স্তরের হাসপাতাল বর্জ্যের নিরাপদ, পরিবেশবান্ধব ও ব্যয়সাশ্রয়ী ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে অগ্রগতি খুব সামান্য। তাছাড়া কোনো অপরাধে দায়ী ডাক্তারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে কোড অব মেডিকেল এথিকস অনুযায়ী ডাক্তারদের নিবন্ধন বাতিল সম্পর্কে নির্দেশনা থাকলেও তার বাস্তবায়ন খুবই সীমিত। অধিকন্তু দায়ী ডাক্তারদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে আইনের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কাজে উপস্থিতি নিশ্চিতকরণে অধ্যাদেশ অনুযায়ী বিনানুমতিতে কাজে অনুপস্থিতির জন্য, বিনানুমতিতে অফিস ত্যাগের জন্য, এবং বিনানুমতিতে বিলম্বে উপস্থিতির জন্য দণ্ড থাকলেও বাস্তবে এর প্রয়োগ সীমিত।

বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনায় নেই যুগোপযোগী আইন (যেমন, নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন আইন এবং কিডনি দান সংক্রান্ত)। এতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতি করার সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং রোগীরা সঠিক মানের চিকিৎসার সুযোগ প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হয়। বেসরকারি পরীক্ষা-নিরীক্ষাসহ অন্যান্য চিকিৎসা ব্যয় সহনীয় পর্যায়ে রাখার কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নি।

এছাড়া জাতীয় বাজেটে স্বাস্থ্যখাতের বরাদ্দের হ্রাস, স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে দৈনন্দিন পরিচালনায় প্রয়োজনের তুলনায় বরাদ্দের স্বল্পতা, প্রয়োজনের তুলনায় মানবসম্পদের স্বল্পতা, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে পদায়ন না থাকা, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনায় দীর্ঘসূত্রতা, সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের তদারকি কার্যক্রম জোরালো না থাকা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

স্বাস্থ্যখাতে নিয়োগ, বদলি, পদায়ন, পদোন্নতির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব, নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের লেনদেন উল্লেখযোগ্য। অধিকন্তু, স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে সরবরাহকৃত বিভিন্ন ধরনের ক্রয়-প্রক্রিয়া, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণে দীর্ঘসূত্রতা, কাজের মান ভালো না হওয়া, ক্ষেত্র বিশেষে চাহিদা যাচাই না করা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

রোগীরা বিভিন্ন ধরনের সরকারি সেবা যথাযথভাবে পায় না বা তারা ভালো মানের সেবা পায় না। যেমন, চিকিৎসক না পাওয়া, হাসপাতাল হতে সরবরাহকৃত পথ্যের মান খারাপ, সকল ধরনের ওষুধ না পাওয়া, ভর্তির সাথে সাথে শয্যা না পাওয়া, জরুরি প্রয়োজনে নার্স ও ওয়ার্ডবয়দের না পাওয়া, ডাক্তার, নার্স ও কর্মচারীদের নিকট হতে প্রত্যাশিত আচরণ না পাওয়া, নির্দিষ্ট ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পাঠানোর পরামর্শ দেওয়া, দালাল দ্বারা হয়রানি ইত্যাদি। তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের সেবা পেতে নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ দিতে হয়। এ সকল সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন ধরনের সেবা দিলেও তা জনগণের চাহিদা অনুযায়ী সেবা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে।

৭.২ স্বাস্থ্যখাতে সুশাসনের ঘাটতির কারণ

গবেষণায় স্বাস্থ্যখাতের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে বিদ্যমান দুর্নীতি ও অনিয়মের ক্ষেত্রে যে সকল প্রতিবন্ধকতা রয়েছে সেগুলোকে সুশাসনের কয়েকটি নির্দেশকের[১৯২] মাধ্যমে চিহ্নিত করা যায়। যেমন, আইনের সীমাবদ্ধতা/অনুপস্থিতি/ প্রয়োগের অভাব; খ) স্বচ্ছতার অভাব; গ) জবাবদিহিতার অভাব; ঘ) সংবেদনশীলতার ঘাটতি; এবং ঙ) তদারকির ঘাটতি। এছাড়াও রয়েছে দলীয়

[১৯২] www.govindicators.org (accessed on 12 June 2014)

রাজনীতিকরণ, দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার ঘাটতি, আর্থিক বরাদ্দের স্বল্পতা, অবকাঠামোগত দুর্বলতা ইত্যাদি। নিম্নে সুশাসনের ঘাটতির কারণ ও প্রভাব সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

৭.২.১ আইনের অনুপস্থিতি

চিকিৎসকের অবহেলায় রোগী মৃত্যুর ঘটনা এবং চিকিৎসকদের ওপর হামলা প্রতিরোধে কার্যকর কোনো আইন না থাকা: চিকিৎসকের অবহেলায় রোগী মৃত্যুর ঘটনার অভিযোগে এবং রোগীর স্বজনদের সাথে চিকিৎসকদের বাকবিতণ্ডা/ হাতাহাতি ইত্যাদি ধরনের ঘটনা প্রতিরোধে কার্যকর কোনো আইন নেই। তাছাড়া হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসা সেবা সম্পর্কিত সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে সাংবাদিকদের সাথে চিকিৎসকদের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে থাকে, যা প্রতিরোধেও তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণে কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নেই। এছাড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা, ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট ইউনিট, ডাক্তার, রোগী, এবং রোগীর অ্যাটেনডেন্টদের কাউন্সিলিং ইত্যাদি ধরনের কোনো ব্যবস্থা নেই। উল্লেখ্য, পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের মহারাষ্ট্র রাজ্য সরকার চিকিৎসকদের ওপর হামলা বন্ধে ২০১০ সালে একটি আইন[১৯৩] পাস করে। এ আইনে কেউ চিকিৎসকদের ওপর হামলা করলে তাকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা এবং তিনবছর পর্যন্ত কারাদণ্ড দেওয়ার বিধান রয়েছে।

বেসরকারি চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনায় কার্যকর এবং বাস্তবসম্মত আইন না থাকা: স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীন নিবন্ধনকৃত ৮ হাজারের অধিক বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম অর্ডিন্যান্স ১৯৮২ দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। যেহেতু অর্ডিন্যান্সটি অনেক পুরাতন, সেহেতু কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনা বাস্তব প্রেক্ষাপটের সাথে সামঞ্জস্য নয় বিধায় অনিয়ম ও দুর্নীতির করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। সাম্প্রতিক সময়ে বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা আইন-২০১০ এর চূড়ান্ত খসড়া তৈরি হলেও প্রায় তিন বছরের অধিক সময় ধরে অনুমোদন করা হয় নি।

বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল কর্তৃক আইনের যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণে উদাসীনতা: বিএমডিসি নিবন্ধনকৃত ডাক্তাররা যাতে নিজ নাম ও পদবির সাথে অতিরিক্ত পেশাগত যোগ্যতা যুক্ত করে পেশাগত চর্চা করতে না পারে তার বিরুদ্ধে বিএমডিসি'র পদক্ষেপ গ্রহণের[১৯৪] দায়িত্ব থাকলেও তা যথাযথ ও কার্যকরভাবে পদক্ষেপ গ্রহণের অভাব রয়েছে, তেমনি ভুয়া ডাক্তারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণেও পদক্ষেপ গ্রহণে উদাসীনতা রয়েছে। উল্লেখ্য, বিএমডিসি'র হিসাবে শুধু রাজধানীতেই আড়াই হাজারের অধিক নকল চিকিৎসক রয়েছে এবং সারা দেশে এ সংখ্যা ২০ হাজারেরও বেশি।[১৯৫] বিএমডিসি মাঝে মাঝে পত্রিকায় নোটিশ দিয়ে এ ধরনের কার্যক্রম হতে বিরত থাকতে সতর্ক করে। তাছাড়া বিএমডিসি এ পর্যন্ত মাত্র দু'জন চিকিৎসকের নিবন্ধন বাতিল করতে সক্ষম হয়েছে। তারপরও অনিয়মের ব্যাপ্তি বিবেচনায় এই ধরনের ভূমিকা খুবই সামান্য। এ প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট অংশীজনরা জানান, যেহেতু ডাক্তারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে ডাক্তারদেরকে প্রধান করে কমিটি গঠন করা হয়, সেহেতু কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে পর্যাপ্ত সাহসের অভাব এবং সারা দেশের ভুয়া ডাক্তারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে বিএমডিসি'র সংশ্লিষ্ট জনবলের অপর্যাপ্ততা রয়েছে।

গণকর্মচারী শৃঙ্খলা (নিয়মিত উপস্থিতি) অধ্যাদেশ, ১৯৮২: চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ে হাসপাতালে উপস্থিত না হওয়া, নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে হাসপাতাল ত্যাগ করা এবং কর্মস্থলে প্রায়শই অনুপস্থিত থাকার অভিযোগ রয়েছে। এক প্রতিবেদন হতে জানা যায়, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কর্মরত চিকিৎসকদের ৮০ শতাংশ কর্মস্থলে উপস্থিত থাকেন না।[১৯৬] গণকর্মচারী শৃঙ্খলা (নিয়মিত উপস্থিতি) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ ধারা ৪, ৫, ও ৬ ধারায় বিনানুমতিতে কাজে অনুপস্থিতি, বিনানুমতিতে অফিস ত্যাগ এবং বিনানুমতিতে বিলম্বে উপস্থিতির জন্য দণ্ড সম্পর্কে বলা হলেও বাস্তবে এর প্রয়োগ সীমিত। সম্প্রতি কর্মস্থলে চিকিৎসকদের অনুপস্থিতিতে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ক্ষোভ প্রকাশ এবং চিকিৎসকদের কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।[১৯৭] কিন্তু এই সাময়িক বরখাস্ত চিকিৎসকদের কর্মস্থলে সর্বদা অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে নি; তাইতো বর্তমান স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিভিন্ন আলোচনা সভায় চিকিৎসকদের ধারাবাহিক কর্মস্থলে অনুপস্থিতি সম্পর্কে জোরালো বক্তব্য তুলে ধরেন।

বেসরকারি চিকিৎসায় পরামর্শ ফি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মূল্য সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকা: বেসরকারি চিকিৎসায় ডাক্তার কর্তৃক পরামর্শ ফি সম্পর্কে যেমন কোনো নীতিমালা নেই, তেমনি পরীক্ষার মূল্য সম্পর্কেও কোনো নীতিমালা নেই। নীতিমালা না

---

[১৯৩] মহারাষ্ট্র মেডিকেল সার্ভিস পার্সন্স অ্যান্ড মেডিকেয়ার সার্ভিস ইন্সটিটিউশন্স অ্যাক্ট ২০১০।

[১৯৪] বিএমডিসি হতে প্রাপ্ত রেজিস্ট্রেশন বাতিলসহ অর্থদণ্ড, কারাদণ্ড অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডণীয়।

[১৯৫] *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪।

[১৯৬] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৪।

[১৯৭] দায়িত্বে অবহেলা ও কর্মস্থলে অনুপস্থিতির কারণে বিগত পাঁচ বছরে সিভিল সার্জনসহ বেশ কয়েকজন চিকিৎসকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। বিস্তারিত জানতে দেখুন, *দৈনিক ইত্তেফাক*, *প্রাগুক্ত*।

থাকায় নিবন্ধনকৃত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে মেডিকেল প্র্যাকটিশনার ও প্রতিষ্ঠাতারা রোগীর নিকট হতে ভিন্ন ভিন্ন পরামর্শ ফি ও পরীক্ষার মূল্য আদায় করছেন।

চাহিদার ভিত্তিতে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার তৈরিতে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা/ পরিকল্পনা না থাকা: দেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার তৈরির জন্য রয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় সহ আরও কয়েকটি উন্নতমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই সকল প্রতিষ্ঠান হতে প্রতি বছর শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন কোর্স সমাপ্ত করছে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় চাহিদার ভিত্তিতে দেশে কতজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার প্রয়োজন এর কোনো মূল্যায়ন করা হয় নি। অর্থাৎ জনসংখ্যা প্রতি কার্ডিওলজিস্ট, অ্যানেসথেসিওলজিস্ট, প্যাথলজিস্ট, গাইনোকোলজিস্ট এবং অন্যান্য কোর্সের কতজন বিশেষজ্ঞ প্রয়োজন তার কোনো মূল্যায়ন করা হয় নি।

৭.২.২ স্বচ্ছতার ঘাটতি

স্বাস্থ্যখাতে নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি: ডাক্তারদের পেশা সংক্রান্ত বিভিন্ন দাবী ও স্বার্থ রক্ষায় এবং স্বাস্থ্যসেবার উন্নতির লক্ষ্যে বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (বিএমএ) গঠিত হয়। এটি ছিল সরকার কর্তৃক স্বীকৃত ডাক্তারদের একমাত্র সংগঠন। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যায়, ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ড্যাব), স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ (স্বাচিপ), ন্যাশনাল ডক্টরস ফোরাম (এনডিএফ) নামে ডাক্তারদের আরও কয়েকটি সংগঠন কার্যক্রম শুরু করে। যখন যে দল ক্ষমতায় আসে সেই দলের প্রার্থীকে দলীয় ডাক্তাররা ভোট দিয়ে বিএমএ প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত করেন। কারণ, দলের প্রার্থীরা জয়ী হলে তাদের মাধ্যমে সরকারের নিকট হতে ডাক্তারদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধরনের দাবি-দাওয়া আদায়ে সুবিধা হয়।

দলীয় রাজনৈতিক সংগঠন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ায় স্বাস্থ্যখাতে নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতিসহ অন্যান্য কার্যক্রমে স্বচ্ছতার অনুপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। এ সম্পর্কে দলের সাথে যুক্ত থাকা একজন চিকিৎসক জানান, প্রত্যেকটি মেডিকেল কলেজে স্বাচিপ/ড্যাব এর আহবায়ক/সভাপতি থাকেন। স্বাস্থ্যখাতে নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতিসহ অন্যান্য কার্যক্রমে স্বাচিপ বা ড্যাব নেতা তাদের সমর্থকদের তালিকা তৈরি করে স্বাচিপ/ড্যাব এর কেন্দ্রীয় নেতার কাছে পাঠিয়ে দেন। কেন্দ্রীয় নেতা ঐ তালিকাটি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর বরাবর পাঠান। দলীয় রাজনৈতিক সংগঠন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ায় স্বাস্থ্যখাতের প্রশাসনিক বিভিন্ন কার্যক্রমে স্বচ্ছতার অনুপস্থিতি লক্ষ্যণীয়।

যন্ত্রপাতি ক্রয়, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ: হাসপাতালের চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ক্রয়, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণে স্বচ্ছতার অভাব লক্ষ্যণীয়। যে কারণে যন্ত্রপাতি ক্রয় ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করা হলেও তা অনেকক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় না। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির চাহিদা দেওয়া হলেও তা সরবরাহ করা হয় না। এক প্রতিবেদনে তিনটি বিভাগের ৫০টি হাসপাতালের ওপর পরিচালিত জরিপে দেখা যায়, সরবরাহকৃত যন্ত্রের মধ্যে **২১** শতাংশ যন্ত্রের প্যাকেটই খোলা হয় নি, **১১** শতাংশ ব্যবহারের আগেই নষ্ট হয়ে গেছে , **১০** শতাংশ ব্যবহার হয়েছিল আংশিক এবং **১১** শতাংশ ঠিক থাকলেও ব্যবহার করা হয় নি।[১৯৮] এই সকল ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণে নিম্নলিখিত যে সকল শর্তাবলীকে বিবেচনায় নেওয়া হয় নি: ১) নির্দিষ্ট যন্ত্রের চাহিদা; ২) যন্ত্রটি ব্যবহারের জন্য অবকাঠামোগত সুবিধা, এবং ৩) দক্ষ জনবল।

তথ্য ব্যবস্থাপনায় ঘাটতি: তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য দেওয়ার জন্য স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়ার কথা থাকলেও হাসপাতালগুলোতে তা নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলোতে ডিজিটাল পদ্ধতিতে তথ্য সংরক্ষণের বিষয়টিও গুরুত্ব পাচ্ছে না। তাছাড়া সরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত নতুন হাসপাতালগুলো (৫০০ শয্যাবিশিষ্ট কুর্মিটোলা ও মুগদা জেনারেল হাসপাতাল) সম্পর্কে প্রচারাভিযানও কম। অধিকন্তু, ভুল চিকিৎসায় রোগী মারা গেলে কি প্রক্রিয়ায় অভিযোগ জানাতে হবে, কোথায় জানাতে হবে সে সম্পর্কেও সাধারণ মানুষের জানার ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে।

কেন্দ্রীয়ভাবে নিবন্ধনকৃত ডাক্তারদের পরিপূর্ণ তথ্যভান্ডার না থাকা: দেশে নিবন্ধনকৃত চিকিৎসকদের পরিপূর্ণ কোনো তথ্যভান্ডার নেই। এটি না থাকার কারণে সাধারণ জনগণেরও চিকিৎসক সম্পর্কে জানার সুযোগ থাকে না। এর ফলে সঠিক চিকিৎসাসেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে সাধারণ জনগণের প্রতারিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এক প্রতিবেদন হতে জানা যায়, মেডিকেল চিকিৎসক না হয়েও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক পরিচয়ে দীর্ঘদিন (৮-১০ বছর) ডাক্তারি কার্যক্রম পরিচালনা করায় অনেক রোগীর অসুখ ভালো হওয়ার চেয়ে রোগীরা আরও জটিল রোগের শিকার হয়েছে এবং অনেকে মারা গেছে।[১৯৯]

[১৯৮] দৈনিক ইত্তেফাক, ২৭/০২/২০১৪।

[১৯৯] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৩।

৭.২.৩ জবাবদিহিতার ঘাটতি

স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা নিয়মিতকরণে জবাবদিহিতা না থাকা: হাসপাতালগুলোতে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও চিকিৎসাসেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে এক পরিপত্রের মাধ্যমে প্রতিমাসে একবার সভা অনুষ্ঠানের জন্য বলা হয়। পরবর্তীতে বিষয়টি নিশ্চিতকরণে সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়।[২০০] এ প্রসঙ্গে স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা জানান, নির্দেশ দেওয়া হলেও নির্দেশ পরবর্তী অধিকাংশ ক্ষেত্রে সভার কার্যবিবরণী নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয় না।

চিকিৎসকদের উচ্চ শিক্ষার প্রশিক্ষণে কার্যকর জবাবদিহি ব্যবস্থা না থাকা: শিক্ষকরা নিয়মিত ক্লাশ নিচ্ছেন কিনা, শিক্ষার্থীরা নিয়মিত ক্লাশ করছেন কিনা, শিক্ষার্থীদের পাশ করতে না পারার কারণ ও তাদের তদারকি ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে এখনও শিক্ষক/প্রশিক্ষকদের মধ্যে জবাবদিহিতার ক্ষেত্র তৈরি করা সম্পূর্ণভাবে সম্ভব হয় নি।

৭.২.৪ সংবেদনশীলতার ঘাটতি

যথাযথ মূল্যায়ন ব্যবস্থায় ঘাটতি: ডাক্তারদের প্রতি বছরের পেশাগত কাজের অগ্রগতি অর্থাৎ বার্ষিক গোপন প্রতিবেদন (এসিআর) মূল্যায়ন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নিয়ম রয়েছে। তবে এর মাধ্যমে কোনো ডাক্তারের পেশাগত কর্মকাণ্ড মূল্যায়নে মানসম্মত ও উন্নত হলেও যেমন তার পদোন্নতি হয় না তেমনি খারাপ হলেও এর প্রভাব কোনো কোনো ক্ষেত্রে ডাক্তারের ওপর পড়ে না।[২০১]

রিটের মাধ্যমে বদলি আদেশ স্থগিত: স্বাস্থ্য বিভাগ কাউকে শাস্তিমূলক বদলি অথবা দূরবর্তী স্থানে পদায়ন দিলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে রিট করা হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত এই রিট নিষ্পত্তি না হয় বদলি আদেশ ততক্ষণ পর্যন্ত কার্যকর হয় না। যে কারণে বদলির আদেশ জারি হলে রিটের মাধ্যমে তা ঠেকিয়ে দেওয়ায় পদটি দিনের পর দিন শূন্য থাকে। **১৯৮৯** সাল থেকে **২০১১** পর্যন্ত অধিদপ্তরের বিরুদ্ধে ৬৪৩টি রিট আবেদন হয়; এর মধ্যে ৯০ শতাংশেরও বেশি রিট অনিষ্পন্ন অবস্থায় রয়েছে।[২০২] রিট আবেদনের মধ্যে অধিকাংশ বদলি ও পদোন্নতি সম্পর্কিত।

৭.২.৫ তদারকির ঘাটতি

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মান নিয়ন্ত্রণে তদারকি কার্যক্রম জোরদার না হওয়া: বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর তদারকি ও তত্ত্বাবধান স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হাসপাতাল ও ক্লিনিক শাখার ওপর থাকলেও প্রয়োজনীয় জনবলের অভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তদারকি কার্যক্রম নিয়মিত হয় না। যার কারণে অনেক ক্ষেত্রে অনুমোদন না নিয়েই পরিচালিত হচ্ছে কিছু হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, পটুয়াখালীতে জেলা সদরসহ বিভিন্ন উপজেলায় ৫৯টি ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মধ্যে **১২**টির অনুমোদন নেই।[২০৩]

৭.২.৬ দলীয় রাজনীতিকরণ

স্বাস্থ্যখাতে নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, ক্রয় প্রভৃতি ক্ষেত্রে দলীয় রাজনীতির প্রভাব কাজ করে। এতে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার প্রত্যাশায় দলীয় রাজনীতিকরণের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

৭.২.৭ দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার ঘাটতি

স্বাস্থ্যখাতে জনবল ব্যবস্থাপনায় দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার যেমন ঘাটতি রয়েছে, তেমনিভাবে নতুনভাবে জনবল নিয়োগের বিষয়ের দিকে মনোযোগ না দিয়ে স্বাস্থ্যপ্রতিষ্ঠানগুলোতে শয্যা সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে।

৭.২.৮ আর্থিক বরাদ্দের স্বল্পতা

স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে দৈনন্দিন পরিচালনায় প্রয়োজনের তুলনায় বরাদ্দের স্বল্পতা রয়েছে। যেমন, অবকাঠামো ও লজিস্টিকস, অ্যাম্বুলেন্স, জেনারেটর, মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও সেবা কার্যক্রম প্রভৃতিতে। এছাড়া জাতীয় বাজেটে স্বাস্থ্যখাতে মোট বরাদ্দ, জিডিপির সাপেক্ষে বরাদ্দ ও স্বাস্থ্যখাতে মোট বরাদ্দে উন্নয়নমূলক ব্যয় ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। অধিকন্তু, স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করা হলেও সে অনুপাতে বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে না।

৭.২.৯ অবকাঠামোগত দুর্বলতা

---

[২০০] স্বাপকম/ হাস-২/ তদারকি কমিটি-১/২০০৭/৯৯৮।

[২০১] ২০১৩ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকদের সাথে মতবিনিময় আলোচনা থেকে প্রাপ্ত তথ্য।

[২০২] ২০০০ সাল হতে ২০০৯ সাল পর্যন্ত রিটের সংখ্যার জন্য দেখুন পরিশিষ্ট ৯।

[২০৩] *দৈনিক যুগান্তর*, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪।

স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে অবকাঠামোগত দুর্বলতা রয়েছে। বিশেষ করে চিকিৎসকদের উপজেলা পর্যায়ে বসবাসের জন্য ব্যবহার উপযোগী আবাসন সুবিধা, চিকিৎসকদের বসার ব্যবস্থা, নারী রোগীর জন্য বহির্বিভাগে পৃথক বসার ব্যবস্থা, যন্ত্রপাতি ও পণ্য রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা প্রভৃতি ক্ষেত্রে।

চিত্র ৭.১: একনজরে সুশাসনের ঘাটতি: কারণ-ফলাফল-প্রভাব

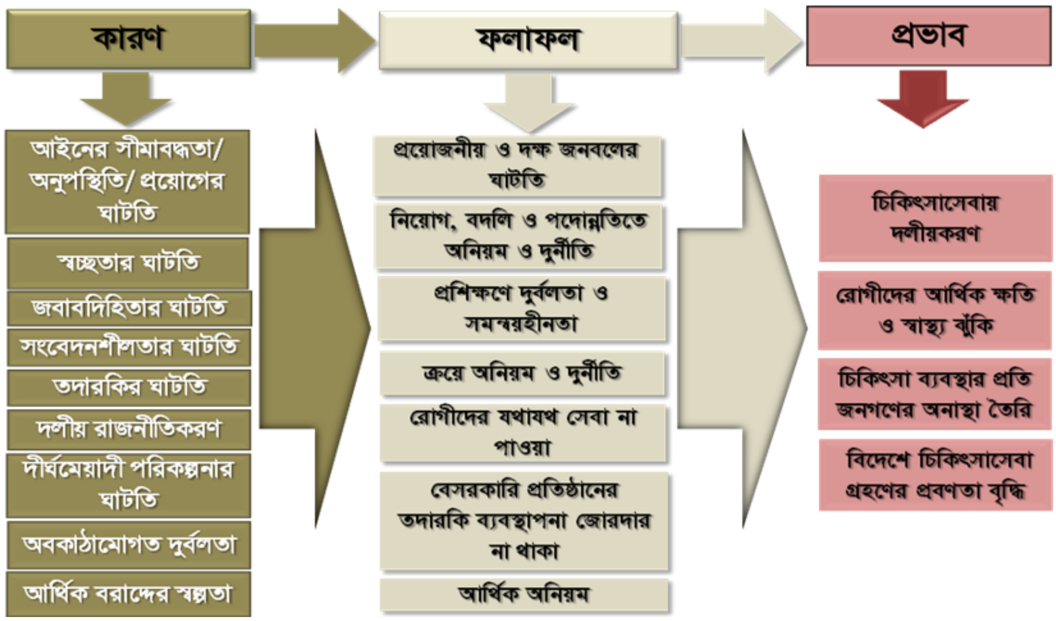

৭.৩ স্বাস্থ্যখাতে সুশাসনের ঘাটতির প্রভাব

স্বাস্থ্যখাতে বিদ্যমান অনিয়ম ও দুর্নীতি সুশাসন নিশ্চিতকরণে প্রভাব ফেলে। নিম্নে এ সকল অনিয়ম ও দুর্নীতির সুদূরপ্রসারী প্রভাব চিহ্নিত করা হল।

৭.৩.১ চিকিৎসার চেয়ে দলীয় রাজনীতিকে অগ্রাধিকার দেওয়া: নিয়োগ, বদলি, পদায়ন, ও পদোন্নতি কার্যক্রমের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে দলীয়করণের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। দলীয় শক্তিই মুখ্য ভূমিকা পালন করে এ সকল কার্যক্রমে অধিক সুবিধা পেতে। যার ফলে প্রত্যেকের মধ্যে দলীয়করণ করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এতে চিকিৎসার চেয়ে দলীয় রাজনীতিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় এবং দক্ষতা সম্পন্ন ডাক্তার তৈরির পথে বাধা সৃষ্টি করে।

বক্স ৭.২: ভুল চিকিৎসায় রোগী মৃত্যুর অভিযোগ

এক রোগী ২২ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে একটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে টিউমারের চিকিৎসার জন্য জরুরি বিভাগে আসেন। কিছুক্ষণ পর চিকিৎসা সহকারী রোগীকে অস্ত্রোপচার করতে হবে বলে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের নিকটে একটি বেসরকারি ফার্মেসিতে নিয়ে যান। সেখানে তিনি রোগীর নিকট হতে ৫০০ টাকা নিয়ে একটি কক্ষে নিয়ে শুইয়ে দেন এবং টিউমারের পাশে একটি ইনজেকশন পুশ করেন। এর পরপরই রোগী মারা যান।

পরবর্তীতে সিভিল সার্জন এবং বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালকের পত্রের প্রেক্ষিতে (প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য লিখিত অনুরোধ করেন) তাকে অন্যত্র বদলি করা হয় এবং নতুন কর্মস্থলে যোগদান করার জন্য ছাড়পত্র দেওয়া হয়।

তথ্যসূত্র: *দৈনিক প্রথম আলো*, ৩০/১০/২০১৩

৭.৩.২: চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রতি জনগণের অনাস্থা তৈরি: নিবন্ধিত ডাক্তারের ভুল চিকিৎসায় এবং ভুয়া চিকিৎসকদের প্রভাবে রোগীরা মৃত্যু ঝুঁকিতে পড়ছেন এবং বাংলাদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার ওপর জনগণের অনাস্থা তৈরি হচ্ছে।

৭.৩.৩: বিদেশে চিকিৎসাসেবা গ্রহনের প্রবণতা বৃদ্ধি: চিকিৎসাসেবা ব্যবস্থার ওপর জনগণের অনাস্থা তৈরিতে দেশের বাইরে চিকিৎসাসেবা গ্রহণের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হচ্ছে। এক প্রতিবেদন হতে জানা যায়, প্রতিবছর প্রায় তিন লক্ষ লোক ভারতে চিকিৎসাসেবার জন্য যায়।[২০৪]

৭.৩.৪ রোগীদের আর্থিক ক্ষতি: স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান হতে চিকিৎসাসেবা নিতে গিয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতি সংঘটিত হওয়ায় রোগীরা পরিপূর্ণ সেবা প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে চিকিৎসাসেবা পেতে রোগীদের নিয়ম-বহির্ভূত অর্থও দিতে হয়, যার ফলে রোগীরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[২০৫] চিকিৎসা ব্যবস্থায় নিয়ম-বহির্ভুত অর্থের লেনদেন এবং সুশাসনের ঘাটতিতে দুর্নীতি ধীরে ধীরে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

৭.৪ সার্বিক পর্যবেক্ষণ

স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে সরকারের গৃহীত উদ্যোগ ও অর্জন ইতিবাচক, তবে এই ইতিবাচক অর্জন আরও বেশি হতে পারতো যদি বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা, দুর্নীতি ও দলীয় প্রভাব না থাকতো। দেখা যায়, স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি, জনবল ও অবকাঠামো উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অভাব রয়েছে। দলীয় রাজনৈতিক প্রভাব রয়েছে বিশেষত জনবল ব্যবস্থাপনায় (নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি), ক্রয়, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতায়। সরকারি ও বেরসকারি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম তদারকি ব্যবস্থায় দুর্বলতা রয়েছে। সর্বোপরি সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক কার্যক্রম ও স্বাস্থ্যসেবায় নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের লেনদেন হয় যা দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়।

৭.৫ সুপারিশ

গবেষণার ফলাফলের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সমস্যা থেকে উত্তরণে নিচের সুপারিশ প্রস্তাব করা হল। এই সুপারিশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে চিকিৎসাসেবার মান বৃদ্ধি পাবে; সর্বোপরি সুশাসন নিশ্চিত হবে বলে আশা করা যায়।

আইন ও নীতি-নির্ধারণী সম্পর্কিত

১. প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন আইন প্রণয়ন ও বিদ্যমান আইনের প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে হবে-
   - বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের আইন লঙ্ঘনের প্রেক্ষিতে শাস্তির পরিমাণ বৃদ্ধি;
   - প্রদত্ত সেবা ও প্রতিষ্ঠানের মান অনুযায়ী পরামর্শ ফি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মূল্য নির্ধারণ;

২. বেসরকারি চিকিৎসা সেবা বিষয়ক খসড়া আইন স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে চূড়ান্ত করতে হবে ও আইন হিসেবে প্রণয়ন করতে হবে।

আর্থিক বরাদ্দ সংক্রান্ত

৩. জাতীয় বাজেটে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে।

৪. মোট বরাদ্দের মধ্যে অনুন্নয়ন বাজেটের পাশাপাশি উন্নয়ন বাজেটের অনুপাতও বৃদ্ধি করতে হবে (উন্নয়ন বরাদ্দ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমস্যা বিদ্যমান থাকলে সেগুলো চিহ্নিত করে সমাধানের জন্যে বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে)।

মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত

৫. সিভিল সার্জন, ডেপুটি সিভিল সার্জন, তত্ত্বাবধায়ক, ইউএইচএফপিও, মেডিকেল টেকনোলজিস্ট, অ্যানেসথেটিস্ট, সিনিয়র কনসালটেন্ট প্রভৃতি শূন্য পদ পূরণে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৬. জনবল নিয়োগে দীর্ঘসূত্রতা দূর করতে হবে; প্রয়োজন অনুযায়ী চাহিদা যাচাই সাপেক্ষে জনবল নিয়োগে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন ও অর্থ মন্ত্রণালয় সমন্বিতভাবে একটি দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৭. স্বাস্থ্যখাতের নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতিসহ সকল ধরনের কর্মকাণ্ডে পেশাজীবী সংগঠনগুলোর দলীয় হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে।

৮. মেধা, জ্যেষ্ঠতা ও কর্মদক্ষতার (পারফরমেন্স) ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য যোগ্য প্রার্থীর নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করতে হবে।

৯. সরকারি ওষুধ চুরি বন্ধে, কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাস্থ্য সহকারীদের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণে তদারকি কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।

সেবা সম্পর্কিত

---

[২০৪] আলোকিত বাংলাদেশ, ৩১/০৫/ ২০১৩।

[২০৫] সরকারি স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণকারী খানার ৪০.২% সেবা গ্রহণে অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার; জাতীয়ভাবে প্রাক্কলিত নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ ৭০.৩ কোটি টাকা। বিস্তারিত জানতে দেখুন, টিআইবি'র জাতীয় খানা জরিপ, ২০১২।

১০. রোগীর তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিটি হাসপাতালে তথ্য ও অনুসন্ধান ডেস্ক কার্যক্রম চালু করতে হবে; নাগরিক সনদ, বিভাগ/ওয়ার্ড ও সেবা প্রদানের অবস্থান নির্দেশকসহ তথ্য বোর্ড টানাতে হবে।
১১. চিকিৎসকের অবহেলা বা ভুল চিকিৎসার ক্ষেত্রে কার্যকর আইন প্রণয়ন ও তার প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।
১২. বিএমডিসি'র ওয়েবসাইটে নিবন্ধিত চিকিৎসকদের ডিগ্রি/ যোগ্যতাসহ তালিকা প্রকাশ করতে হবে এবং নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে। এসএমএস-এর মাধ্যমে নিবন্ধিত ডাক্তারের অনুসন্ধানের ব্যবস্থা চালু করতে হবে।
১৩. কর্মস্থলে চিকিৎসকদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য-
- বসবাসের উপযোগী আবাসন সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।
- প্রত্যন্ত এলাকার জন্য এবং ছুটিকালীন দায়িত্ব পালনের জন্য বিশেষ প্রণোদনা ভাতা দিতে হবে।

১৪. স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা নিয়মিতকরণ করতে হবে এবং সভা নিয়মিতকরণে স্থানীয় সংসদ সদস্যদের সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

ক্রয়, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কিত

১৫. ঠিকাদার নির্বাচনে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে সকল ক্ষেত্রে ই-টেন্ডারিং প্রক্রিয়া চালু করতে হবে।
১৬. বিভিন্ন পর্যায়ের হাসপাতালে সেবার ধরন ও সেবা প্রদানে জনবল, যন্ত্রপাতি, আনুষঙ্গিক স্থাপনা বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় নির্ধারণে একটি এসওপি (স্ট্যান্ডার্ড অপারেশন প্রসিডিউর) তৈরি করতে হবে।
১৭. সরকারি হাসপাতালে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সেবাগ্রহীতা থেকে প্রাপ্ত আয়ের একটি অংশ (৫০%) জরুরি প্রয়োজনে (অ্যাম্বুলেন্স ও চিকিৎসা যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ) খরচের ক্ষমতা দিতে হবে।

তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, অনুচ্ছেদ ১৫ ও ১৮।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, *জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ২০১১: সুস্বাস্থ্য উন্নয়নের হাতিয়ার*।
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, *নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৪*।
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, *স্বাস্থ্য বুলেটিন* ২০১১।
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, *স্বাস্থ্য বুলেটিন* ২০১৩।
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১২-২০১৩।
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, *বার্ষিক প্রতিবেদন* (২০১০-২০১১ হতে ২০১১-২০১২)।
বাংলাদেশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন, ২০০৪, *গঠনতন্ত্র, স্মারকলিপি, ধারা ও উপধারাসমূহ*।
অর্থ মন্ত্রণালয়, *বাজেট বক্তৃতা* (২০১৩-১৪ হতে ২০১৪-১৫)।
মোহাম্মদ ফিরোজ মিয়া, ২০১৩, *চাকরির বিধানাবলী*, (পঞ্চাশতম সংস্করণ), রোদ্দুর প্রকাশনী, ঢাকা।
বিচারপতি ছিদ্দিকুর রহমান মিয়া, ২০১৪, *চাকরির বিধিমালা*, (সপ্তম সংস্করণ), কামরুল বুক হাউস, ঢাকা।
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, 'সরকার কর্তৃক স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের প্রতিটি ১০, ২০, ৩১, ৫০, ১০০, ১৫০, ২০০, ২৫০, ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের জন্য জনবলের Standard Setup,' ২৩ ডিসেম্বর ২০০৮।
বাংলাদেশ কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়, *বিশেষ অডিট রিপোর্ট: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতাল, অর্থ বছর ১৯৯৮-১৯৯৯ হতে ২০০৫-২০০৬*, ঢাকা।
টিআইবি, *সেবাখাতে দুর্নীতি, জাতীয় খানা জরিপ ২০১২*, ঢাকা।
টিআইবি, *রিপোর্ট কার্ড জরিপ* (২০১১, ২০১২ ও ২০১৩ সালে স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের ওপর সম্পন্ন)।
টিআইবি, *বেজলাইন জরিপ ২০১১*, ঢাকা।
টিআইবি, *বেজলাইন জরিপ ২০০৯*, ঢাকা।
টিআইবি, ২০১৩, 'ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল: সুশাসনের অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়', ৭ অক্টোবর ২০১৩, ঢাকা।

Hussmann, Karen, 2011, 'Addressing corruption in the health sector, securing equitable access to health care for everyone', *U4 Issue*, January 2011, No 1.
Bangladesh Academy for Rural Development (BARD), 2013, *Governance of Rural Health Service Delivery, Case Studies of Three Upazil, Health Complex of Bangladesh*, Kotbari, Comilla, June.
MSI, 2002, *Corruption and the Health Sector, Sectoral Perspectives on Corruption*, Sponsored by USAID.
Office of the Comptroller and Auditor General of Bangladesh, 2012, *Annual Report-2011, Special/ Issue based Audit* www.cag.org.bd.
www.govindicators.org (accessed on 12/06/2014)
www.mohfw.gov.bd (accessed on 20/11/2013)
www.dgfpbd.org, (accessed on 24/06/2014)
www.edcl.gov.bd, (accessed on 24/06/2014)
www.heu.gov.bd (accessed on 20/06/2014)
www.bmdc.org.bd (accessed on 23/06/2014)
www.smf.edu.bd (accessed on 11/06/2014)
www.bps-bd.org (accessed on 11/06/2014)
www.mof.gov.bd (accessed on 6/06/2013 & 10/06/2013)
www.dghs.gov.bd (accessed on 24/07/2013)
www.pbsc.gov.bd (accessed on 24/07/2013)
www.mopa.gov.bd (accessed on 24/07/2013)

পরিশিষ্ট ১: বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সাধারণ তথ্য

বিষয়	পরিস্থিতি
উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতাল স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	৪৩৬টি
ইউনিয়ন পর্যায়ের স্বাস্থ্যকেন্দ্র	১,৩৯৩টি
জেলা পর্যায়ের	৬৪টি
সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	২২টি
রেজিস্টার্ড চিকিৎসক	৬৪,৪৩৪ (স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ধীন-৩৫%; অন্যান্য মন্ত্রণালয়-৩%; বেসরকারি-৬২%)
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরাধীন রেজিস্টার্ড চিকিৎসক	১৫,৯২২
রেজিস্টার্ড নার্স	৩০,৫১৬
সরকারি খাতে নার্স (বিদ্যমান)	১৩২৩৫
ডাক্তার প্রতি জনসংখ্যা	১:৩২৯৭
নার্স প্রতি জনসংখ্যা	১: ১১৬৯৬
মেডিকেল টেকনোলজিস্ট প্রতি জনসংখ্যা	১:২৭৮৪২
মোট শয্যা	৯১,১০৬
শয্যা ও জনসংখ্যা অনুপাত	১:১,৬৯৯
ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্য সহকারী	১:.৫৪:.২৭
পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিকেল ডিগ্রির সিট সংখ্যা (এমডি/ এমএস/ ডিপ্লোমা/ এমফিল/ এমপিএইচ/ এমএমইডি ইত্যাদি)	২২৭০টি; (সরকারি: ২০৯১; বেসরকারি: ১৬৯)
এফসিপিএস, এমসিপিএস	৪০০ (প্রতি বছরের জন্য)
পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিকেল টিচিং ইন্সটিটিউট	৩৩টি; (সরকারি: ২৩টি; বেসরকারি: ১০টি)
রেজিস্টার্ড বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিক	২৯৮৩টি
রেজিস্টার্ড বেসরকারি ডায়াগনস্টিক সেন্টার	৫২২০টি

তথ্যসূত্র: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, *স্বাস্থ্য বুলেটিন* ২০১৩।

পরিশিষ্ট ২: স্বাস্থ্যখাতে সরকারের গৃহিত উন্নয়নমূলক কার্যক্রম (২০০৯-২০১২)

উপ-খাত	স্বাস্থ্যখাতে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম
কমিউনিটি ক্লিনিক	▪ ১৩,৫০০টির মধ্যে ১২,২১৭টি কমিউনিটি ক্লিনিক হতে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান। ▪ ১৩,৫০০টি কমিউনিটি হেলথ্ প্রোভাইডার পদের মধ্যে ১৩২৪০টি পদে নিয়োগ প্রদান। একটি কমিউনিটি ক্লিনিকে ১জন সিএইচসিপি, ১জন এফডাব্লিউএ এবং ১জন এইচএ স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছে। ▪ ওষুধের সরবরাহ নিশ্চিতে ৪০০ কোটি টাকার ২৯ প্রকার ওষুধ সরবরাহ, অসংক্রামক রোগ (উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, যক্ষ্মা) চিহ্নিতকরণ, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন, ব্লাড প্রেসার, এবং ইউরিন পরীক্ষা করা হচ্ছে। ▪ সেবাগ্রহীতার সংখ্যা এবং উচ্চতর পর্যায়ে রেফারের সংখ্যা পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি।
স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণ	▪ মাতৃমৃত্যু রোধে জরুরি প্রসূতি সেবা কার্যক্রম ১৩২টি উপজেলা থেকে ১৫২টি উপজেলায় সম্প্রসারণ, দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মায়েদের সেবা প্রদানে ***মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কীম*** ৩৫টি উপজেলা থেকে ৫৩টি উপজেলায় সম্প্রসারণ, টিকাদান কভারেজ ৭৫% থেকে ৮০.২%, ৬ মাস থেকে ৫৯ মাস বয়সী শিশুদের মধ্যে ভিটামিন 'এ' গ্রহণের হার ৮৮% থেকে ৯৫%। ▪ বিভিন্ন সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণে কার্যক্রম গ্রহণ, কালাজ্বর রোধে ১০০টি উপজেলায় আইআরএস প্রকল্প গ্রহণ। ▪ ৪৪টি জেলা হাসপাতাল, ১৯৩টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে (১০টি নৌ অ্যাম্বুলেন্সসহ) অন্যান্য ৩০টি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে মোট ২৬৭টি অ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ।
দুর্যোগকালীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থা	▪ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীন ''ন্যাশনাল হেলথ ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম চালু'র মাধ্যমে দুর্যোগকালীন সময়ে বিভাগীয় পর্যায় থেকে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত দুর্যোগ স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
স্বাস্থ্য জনশক্তি	▪ অ্যাডহক ভিত্তিতে ৪১৩৩ জন চিকিৎসক নিয়োগ, ১,৯৪৫ জন সহকারী সার্জন/ ডেন্টাল সার্জন নিয়োগ প্রদান (২৮ থেকে ৩১তম বিসিএস এর মাধ্যমে)। ▪ চিকিৎসকদের সহায়তা প্রদানে ১,৭৪৭ জন সিনিয়র স্টাফ নার্স নিয়োগ প্রদান এবং সিনিয়র স্টাফ নার্সদের পদ মর্যাদা ২য় শ্রেণিতে উন্নীত। অধিকন্তু প্রায় ৬০ হাজার স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ। ▪ ৯ম গ্রেডের চিকিৎসককে ৭ম গ্রেডের স্কেল প্রদান (২,২৭১জন) এবং ৬ষ্ঠ গ্রেডের চিকিৎসককে ৫ম গ্রেডের স্কেল প্রদান (১,৪৬১জন)। ▪ সহকারী পরিচালক পদে পদোন্নতি (৬ষ্ঠ গ্রেড থেকে ৫ম গ্রেড-৩৮২), উপ-পরিচালক/ সমমান পদে পদোন্নতি (৫ম গ্রেড থেকে ৪র্থ গ্রেড-১২৬), পরিচালক/ সমমান পদে (৪র্থ থেকে ৩য় গ্রেড-১৭)।
ডিজিটাল স্বাস্থ্যব্যবস্থা	▪ ওয়েব ক্যামেরা ও ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালক, সিভিল সার্জন ও উপজেলা স্বাস্থ্য অফিসের দ্বারা অফিস উপস্থিতি তদারকি হয়। এছাড়া ফিঙ্গার প্রিন্ট মেশিনের মাধ্যমে ডিজিটাল তদারকি ব্যবস্থা চালু করা হয়। ▪ জাতীয় থেকে উপজেলা পর্যায় সকল সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হয়। ▪ স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়নের লক্ষ্যে ৮০০ স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান থেকে নাগরিকগণ সরাসরি এসএমএস -এর মাধ্যমে অভিযোগ পরামর্শ পাঠাচ্ছেন।
স্বাস্থ্য অবকাঠামো	**উপজেলা:** ১৩৬টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ, নবসৃষ্ট ১২টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজের আওতায় ৯টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মিত এবং বাকি ৩টির নির্মান শেষ পর্যায়ে, ১৩৬টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৩১-৫০ শয্যায় উন্নীত। **জেলা:** ৩টি ৫০ শয্যা জেলা হাসপাতাল ১০০ শয্যায় উন্নীত, ৫টি ১০০ শয্যা হাসপাতাল ২৫০ শয্যায় উন্নীত, ৩টি জেলা সদর হাসপাতালে সিসিইউ নির্মাণ। **মেডিকেল কলেজ ও বিশেষায়িত:** ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল নির্মাণ, ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট খিলগাঁও জেনারেল হাসপাতাল চালু, ৩০০ শয্যা বিশিষ্ট ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব নিউরোসায়েন্স নির্মাণ, ১০০ শয্যা বিশিষ্ট ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ইএনটি স্থাপন, বিএসএমএমইউ -কে সেন্টার অফ এক্সিলেন্সে রুপান্তরকরণ প্রভৃতি।

তথ্যসূত্র: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, *স্বাস্থ্য বুলেটিন* ২০১৩।

পরিশিষ্ট ৩: স্বাস্থ্য অধিদপ্তরাধীন স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে মোট বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)

	২০১৩-২০১৪	২০১২-২০১৩ (সংশোধিত এডিপি)		
কর্মসূচি	বরাদ্দ	বরাদ্দ	ব্যয়	ব্যবহার (%)
এসেনশিয়াল সার্ভিস ডেলিভারি (ইএসডি)	৭,৪০০.০০	৪,৪৩১.০০	৪,০০৪.০৪	৯০.৪
মাতৃত্ব, নবজাতক, শিশু ও বয়স্ক স্বাস্থ্য পরিচর্যা	৪৩,৭০০.০০	৪২,৯২৬.০০	৪০,২৭৩.৫০	৯৩.৮
কমিউনিটি বেইজড হেলথকেয়ার	৭,৮৫০.০০	৭,২৫০.০০	৬,৭১৮.৪৪	৯২.৭
যক্ষা ও কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ	৫,৭২০.০০	৭,০৬২.০০	৬,১৯২.৩৫	৮৭.৭
জাতীয় এইডস/ এসটিডি কার্যক্রম	৩,৮০৫.০০	২,৮০০.০০	২,২৪৬.০০	৮০.২
কমিউনিকেবল ডিজিজ কন্ট্রোল	১৩,২০০.০০	৯,৮০০.০০	১০,৩৬৬.৪৩	১০৫.৮
নন-কমিউনিকেবল ডিজিজেস কন্ট্রোল	১০,১৪৭.০০	১২,২১৫.০০	১১,২৫৪.৫৯	৯২.১
ন্যাশনাল আই কেয়ার	৩৩৫.০০	৪৪৫.৯০	৪০৩.২২	৯০.৪
ইমপ্রুভড্ হসপিটাল সার্ভিসেস ম্যানেজমেন্ট	৩৭,০০০.০০	৪৩,৪৮৫.০০	৪২,৩৪৩.৭৭	৯৭.৪
অল্টারনেটিভ মেডিকেল কেয়ার	১,২৫০.০০	১,২৯২.০০	১,২৭৫.৭০	৯৮.৭
ইন-সার্ভিস ট্রেনিং	৩,৯৬৪.০০	৫,৫১০.০০	৪,৬২৫.২২	৮৩.৯
প্রি-সার্ভিস এডুকেশন	১৪,০০০.০০	১৬,৭৩৬.০০	১৫,৯২৩.৩৩	৯৫.১
প্লানিং, মনিটরিং এবং রিসার্চ	১,১৭৭.০০	৯০০.০০	৮১৪.৭৭	৯০.৫
হেলথ ইনফরমেশন সিস্টেম অ্যন্ড ই হেলথ	১২,৫০০.০০	১১,০২৫.০০	১০,৯৭৩.৬২	৯৯.৫
হেলথ এডুকেশন অ্যান্ড প্রোমোশন	২,২০০.০০	১,৯৫০.০০	১,৭৯৮.৬৫	৯২.২
প্রকিউরমেন্ট, লজিস্টিকস অ্যণ্ড সাপ্লাইজ	৪,৩৫০.০০	৬,২৮৩.০০	৬,১৯৪.৪০	৯৮.৬
ন্যাশনাল নিউট্রিশন প্রোগ্রাম	৮,৫০০.০০	৫,১০০.০০	৩,৬১১.৯৯	৭০.৮
মোট	**১৭৭,০৯৮.০০**	**১৭৯,২১০.৯০**	**১৬৯,০৩১.০০**	**৯৪.৩১**

তথ্যসূত্র: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, *স্বাস্থ্য বুলেটিন* ২০১৩।

পরিশিষ্ট ৪: স্বাস্থ্য অধিদপ্তরাধীন ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে জনবলের ক্রমাধিকার

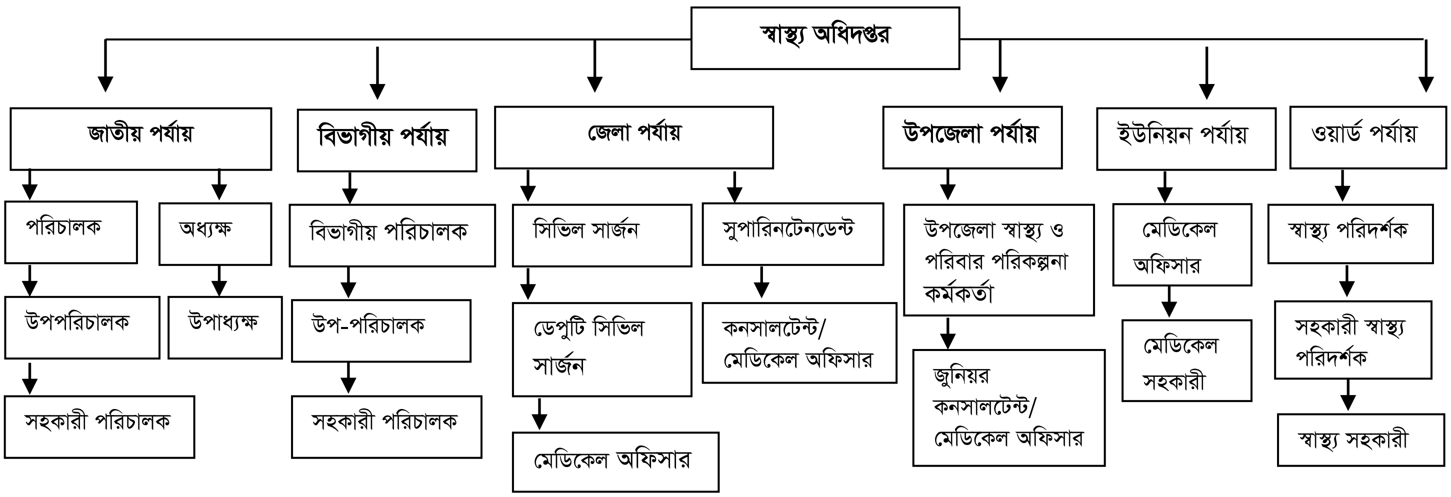

পরিশিষ্ট ৫: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অর্গানোগ্রাম

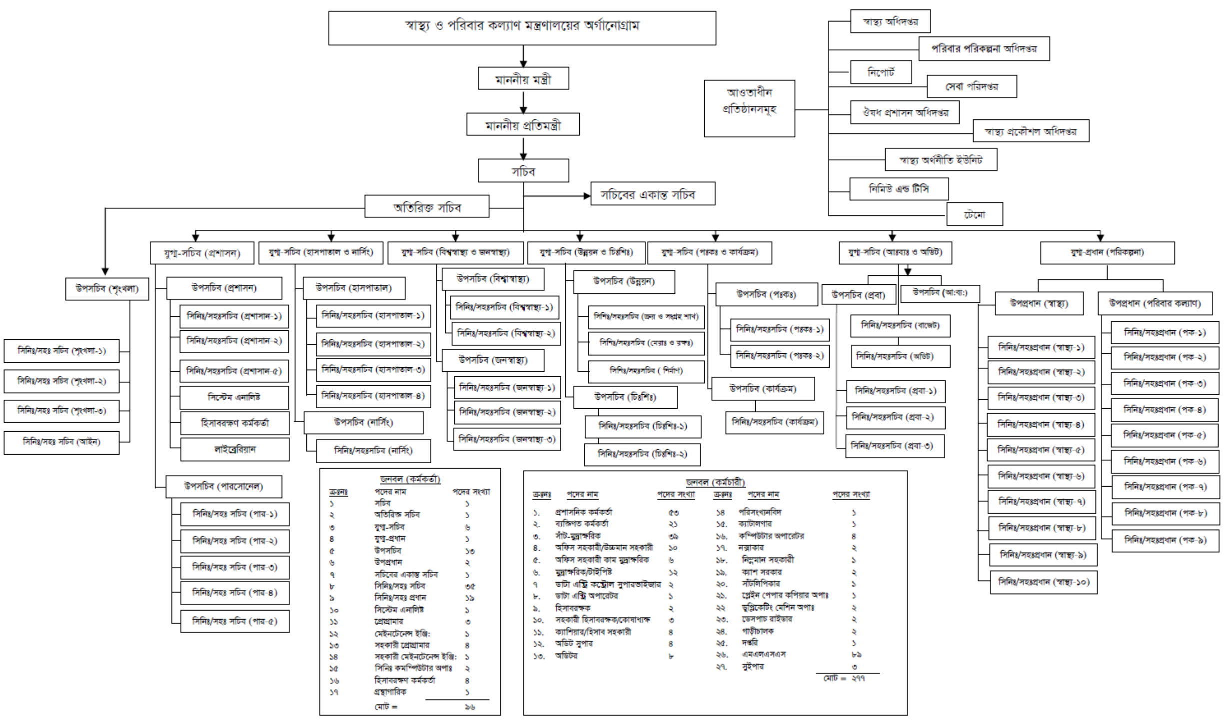

পরিশিষ্ট ৬: সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে সংঘটিত অপ্রীতিকর ঘটনা

প্রতিষ্ঠান	সমস্যার ধরন	ঘটনার প্রতিবাদে চিকিৎসক ও কর্মচারীদের প্রতিক্রিয়া
ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (মে ২০১৩)	▪ রোগীর স্বজন হাসপাতালের জরুরি বিভাগে মোটরসাইকেল রাখলে ইন্টার্ন চিকিৎসক কর্তৃক বাঁধা এবং রোগীর স্বজন কর্তৃক স্থানীয় লোকজনকে ডেকে চিকিৎসককে মারধর	▪ জড়িতদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে ইন্টার্ন চিকিৎসক কর্তৃক কর্মবিরতি
মিটফোর্ড হাসপাতাল (ডিসেম্বর ২০১৩)	▪ হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে এক রোগীর পরীক্ষা প্রতিবেদন নিয়ে শিক্ষানবীশ চিকিৎসকের সাথে হাসপাতালের কর্মচারীদের বিরোধ	▪ দায়ী কর্মচারীদের শাস্তির দাবিতে অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি ডাকেন শিক্ষানবিশ চিকিৎসকরা
ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (ফেব্রুয়ারি ২০১৪)	▪ রোগী মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে রোগীর স্বজনরা চিকিৎসককে গালমন্দ করলে শিক্ষানবীশ চিকিৎসক কর্তৃক স্বজনদের হাসপাতালে আটক করে রাখা ▪ গণমাধ্যম কর্মীরা হাসপাতালে হাজির হলে ইন্টার্ন চিকিৎসক কর্তৃক তাদের ক্যামেরা ছিনিয়ে নেয়া এবং তাদেরকে মারধর	▪ ইন্টার্ন চিকিৎসক কর্তৃক কর্মবিরতি
ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল ইন্সটিটিউট হাসপাতাল (মার্চ ২০১৪)	▪ চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী অনুমতি না নিয়ে নারী শিক্ষানবিশ চিকিৎসকের কক্ষে (আবাসনের ব্যবস্থা রয়েছে) প্রবেশ করায় চিকিৎসক কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগ করায় কর্মচারী কর্তৃক চিকিৎসকদের ওপর হামলা ▪ চিকিৎসকরা মানব বন্ধন করলে পুনরায় কর্মচারী কর্তৃক তাদের ওপর হামলা এবং উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ	▪ শিক্ষানবীশ চিকিৎসক কর্তৃক অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (এপ্রিল ২০১৪)	▪ জরুরি বিভাগে অক্সিজেন থাকা সত্ত্বেও রোগীকে সরবরাহ না করা এবং পরবর্তীতে রোগীকে অন্য ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হলেও কর্তব্যরত চিকিৎসকের (ডাকা সত্ত্বেও না আসায়) দায়িত্বে অবহেলায় রোগী মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইন্টার্ন চিকিৎসক এবং কর্মচারীদের সাথে স্বজনদের সংঘর্ষ ▪ গণমাধ্যম কর্মীরা খবর সংগ্রহে গেলে ইন্টার্ন চিকিৎসক কর্তৃক তাদের মারধর	▪ ইন্টার্ন চিকিৎসক কর্তৃক অঘোষিত কর্মবিরতি পালন
বারডেম হাসপাতাল (এপ্রিল ২০১৪)	▪ রোগী মৃত্যুর ঘটনায় রোগীর স্বজন কর্তৃক নার্সদের অবহেলাকে দায়ী করলে উপস্থিত চিকিৎসকদের সাথে স্বজনদের বাকবিতণ্ডা এবং হাতাহাতি	▪ চিকিৎসক কর্তৃক সড়ক অবরোধ, মানব বন্ধন ও কর্মবিরতি পালন ▪ এ সময় জরুরি বিভাগ, সিসিইউ ও আইসিইউতে চিকিৎসা কার্যক্রম স্বাভাবিক ছিল
জেড এইচ শিকদার উইমেন'স মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল (হাজারিবাগ) (মে ২০১৪)	▪ একই ডাক্তারের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কখনো সহযোগী অধ্যাপক এবং কখনো অধ্যাপক পদবি ব্যবহার করে চিকিৎসা চর্চা অনুশীলন ▪ (সহযোগী অধ্যাপক-চিটগং মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং অধ্যাপক জেড এইচ শিকদার উইমেন'স মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল)	▪ বিষয়টি নিয়ে গণমাধ্যম অনুসন্ধান চালালে ক্ষিপ্ত হয়ে উক্ত ডাক্তার তার সহযোগীদের নিয়ে প্রথম আলোর বিশেষ প্রতিনিধিকে দু' ঘন্টা আটকে রেখে মারধর এবং মুচলেকা নিয়ে ছেড়ে দেওয়া
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (মে ২০১৪)	▪ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-২ এর সাত তলায় চিকিৎসকদের জন্য নির্ধারিত লিফট ব্যবহার করাকে কেন্দ্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সাথে অবৈতনিক (অনারারী) ও শিক্ষানবীশ চিকিৎসকদের মারামারি ও জরুরি বিভাগ ভাঙচুর ▪ ঘটনার সংবাদ সংগ্রহ করায় গণমাধ্যম কর্মীদের ওপর চিকিৎসক কর্তৃক হামলা ও তাদের ক্যামেরা ভাঙচুর।	▪ অবৈতনিক (অনারারী) ও শিক্ষানবীশ চিকিৎসক কর্তৃক কর্মবিরতির ঘোষণা
খুলনা সকল সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল (জুলাই ২০১৪)	▪ সড়ক দুর্ঘটনায় আহত চারুকলা ইন্সটিটিউটের ছাত্র বেসরকারি গাজী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার তিন ঘন্টা বিলম্বে আসেন এবং কর্তব্যরত নার্স ও কর্মচারীদের খারাপ ব্যবহারের কারণে পরবর্তীতে রোগীকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নেওয়ার পথে মারা যায়। এ নিয়ে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ছাত্র উক্ত হাসপাতালে হামলা চালায়।	▪ বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশ (বিএমএ), খুলনা প্রাইভেট ক্লিনিক ডায়াগনস্টিক ও নার্স অ্যাসোসিয়েশন ও বাংলাদেশ প্রাইভেট মেডিক্যাল প্র্যাকটিশনার অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক যৌথভাবে দুইদিনের ধর্মঘটের ডাক দেয় ▪ পরবর্তীতে দাবি আদায় না হওয়ায় খুলনার সকল সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল-ক্লিনিক এবং প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরি লাগাতার ধর্মঘটের ডাক; এ সময় সরকারি হাসপাতালের জরুরি বিভাগে চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম অব্যাহত ছিল।

পরিশিষ্ট ৭: বেসরকারি চিকিৎসায় সরকারি নিবন্ধকৃত ডাক্তারদের পরামর্শ ফি'র নমুনা

ডাক্তারের ধরন	টাকা (প্রতি ভিজিট)
মেডিকেল অফিসার এমবিবিএস, এফসিপিএস (সার্জারি), প্রশিক্ষণরত	৪০০
সহযোগী অধ্যাপক এমবিবিএস, এফসিপিএস, এমডি	৪০০
মেডিকেল অফিসার এমবিবিএস, এফসিপিএস (পার্ট-২)	৩০০
মেডিকেল অফিসার এমবিবিএস	৩০০
সিনিয়র কনসালটেন্ট, মেডিসিন ও কিডনি রোগ বিশেষজ্ঞ এমবিবিএস (ডিএমসি), এমডি (নেফ্রোলজী)	১০০০
জুনিয়র কনসালটেন্ট, চক্ষু বিভাগ এমবিবিএস, এফসিপিএস (চক্ষু বিশেষজ্ঞ ও সার্জন)	৫০০
নিউরোলজী বিভাগ, স্নায়ুরোগ ও মেডিসিন বিশেষজ্ঞ এমবিবিএস, এফসিপিএস (মেডিসিন), এমডি (নিউরোলজী)	৫০০
অধ্যাপক, স্ত্রীরোগ ও প্রসূতিবিদ্যা বিশেষজ্ঞ এবং সার্জন এমবিবিএস, এফসিপিএস (গাইনি)	৫০০
অধ্যাপক এমবিবিএস, এফসিপিএস (অবস্ ও গাইনি)	৭০০
অধ্যাপক, মেডিসিন এফসিপিএস, এফআরসিপি (গ্লাসগো ও ইডি), এফসিসিপি, এফএসিপি	৮০০

পরিশিষ্ট ৮: হাসপাতাল অনুযায়ী পরীক্ষার মূল্যের ভিন্নতা (টাকা)

পরীক্ষার নাম	ল্যাব এইড	ইউনাইটেড	মেডিনোভা	পপুলার	হেলথ কেয়ার ডায়াগনস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার	অনামিকা হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার
ক্রিয়েটিনিন	৩০০	৫২০	৩০০	৩০০	৩০০	৩০০
কোলেস্টোরেল	৩০০	৪৫০			৩০০	২৫০
সিরাম ইলেক্ট্রোলাইট	৩০০	১০০০	৮০০		৮০০	৬০০
সিরাম বিলুরুবিন	৮৫০	৩৫০				
সিবিসি	৪৫০	৫৫০	৪৫০	৪৫০	-	৩৫০
আল্ট্রাসনোগ্রাম (হোল এবডোমেন)	১৮০০		১০০০	১০০০	৬০০	৬০০
মূত্র	৩০০	৩৫০	১৫০	১৫০	১৫০	১৫০

তথ্যসূত্র: সংশ্লিষ্ট ডায়াগনস্টিক সেন্টার হতে প্রাপ্ত তথ্য; তারিখ: মার্চ ও এপ্রিল ২০১৪।

পরিশিষ্ট ৯: বদলি ও পদায়ন সংক্রান্ত রিট আবেদনের সংখ্যা

সাল	বদলি সংক্রান্ত রিট আবেদনের সংখ্যা
২০০০	২৯টি
২০০১	২০টি
২০০২	১৫টি
২০০৩	৪৮টি
২০০৪	৩৯টি
২০০৫	৩৩টি
২০০৬	৬৩টি
২০০৭	৪০টি
২০০৮	৬১টি
২০০৯	৪৩টি

তথ্যসূত্র: *দৈনিক যুগান্তর*, ২১/০৪/২০১৩।